দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ২৫ মে, ২০২০।। ১১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৭।।

যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

আত্মনির্ভর ভারতের
প্রস্তুতি — পৃঃ ৮

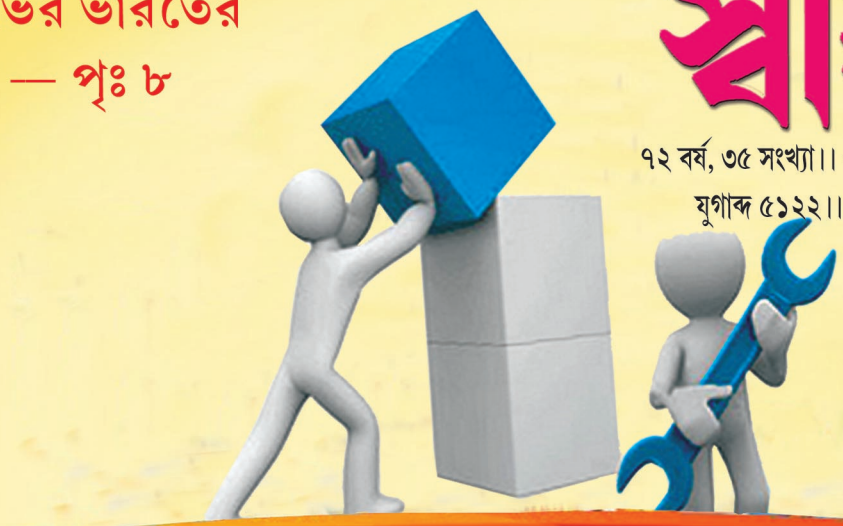

স্বদেশী অর্থনীতিই আত্মনির্ভরতার একমাত্র পথ

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৫ মে - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

করোনার আবহে অর্থনৈতিক সংকটে আত্মনির্ভরতাই হতে পারে একমাত্র মন্ত্র ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৫

আত্মনির্ভর ভারতের প্রস্তুতি
▯ ড. মনোমহন বৈদ্য ▯ ৮

করোনা ও অর্থনীতির সংকট : সমাধান একমাত্র স্বদেশী
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১২

পারস্পরিক বাণিজ্য নির্ভরতার চেয়ে মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাব ভারতের দুর্বলতার বড় কারণ
▯ সঞ্জয় বারু ▯ ১৫

করোনার থাবার মধ্যেও হামলা, বাংলাদেশে অস্তিত্ব সংকটে হিন্দুরা ▯ ১৭

নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখছেন, বিজয় মাল্যের জেল ঘণ্টী শোনা যাচ্ছে ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৮

বাঙ্গালির শিরায় ধমনীতে মহাকাব্যের স্রোত
▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ২০

পরলোকে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রবীণা সেবিকা শ্রীমতী কমল চক্রবর্তী ▯ ২৩

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তফাত কিন্তু মানসিকতায়

বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফান পশ্চিমবঙ্গে মারণ আঘাত হানিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকা এই ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন হইয়াছেন। সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে, এখনও পর্যন্ত এই ঘূর্ণিঝড়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনার বহু গ্রাম নদীবাঁধ ভাঙিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। কৃষিকার্যের ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়াছে। আমফানের তাণ্ডব হইতে কলিকাতাও রক্ষা পায় নাই। বস্তুত, ঝড়ের পরে কলিকাতা শহরের দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই শিহরিত হইয়া উঠিতেছেন। কলিকাতা শহরকে মনে হইতেছে যেন বোমায় বিধ্বস্ত কোনো নগরী। ২০০৯ সালের আয়লা অপেক্ষা এইবার আমফানের তাণ্ডব শতগুণ। অনেকেই এইবারের এই ঝঞ্ঝাকে ১৯৩৭ সালের ঝড়ের সহিত তুলনা করিতেছেন। বলিতেছেন, ১৯৩৭ সালের পরে এই দ্বিতীয়বার ঝড়ের এমন বিধ্বংসী তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করিল রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দারা। এই বিধ্বংসী ঝড়ে কত ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহার এখনো বিস্তারিত হিসাব পাওয়া যাই নাই। তবে, সকলেই অনুমান করিতেছেন এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকার কম হইবে না। কাঁচা, পাকা বহু বাড়ি ধূলিসাৎ হইয়াছে। রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণও প্রভূত হইবে এমনটাই আশঙ্কা হইতেছে। করোনা সংকটের পাশাপাশি এই ঘূর্ণিঝড় রাজ্যকে আরও এক গভীর সংকটের মুখে ফেলিয়াছে। এই সংকটকালে সমস্ত রকম ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে একত্রে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান জানাইয়াছেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা । রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও এই বিপদের মুহূর্তে সর্বশক্তি লইয়া ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের এই বিপর্যয়ে রাজ্যের পাশে থাকিবার আশ্বাস দিয়াছে সমগ্র দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলিয়াছেন, এই সংকট মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সব রকম সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতই রাজ্য সরকারকে সহায়তা করিবার আশ্বাস দিন না কেন, যতই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া সংকটের সময় একত্রে কাজ করিবার বার্তা দিক না কেন, ভবি তবু ভুলিবার নয়। রাজ্যবাসী এই তাণ্ডবের পরদিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছে যে, একটি পক্ষ এই সংকটের সময়ও ঘৃণ্য রাজনীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। আমফানের তাণ্ডবের পরদিনই তাহারা এই রব তুলিয়া দিল যে, 'পশ্চিমবঙ্গের এই বিপর্যয়েও প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুঃখ তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে নাই।' এই সব অভিযোগের যে কোনো সারবত্তা নাই এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত অসূয়াবশত যে এই সব কথাবার্তা বলা হইতেছে তাহাও অচিরেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। এইসব অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যে আসিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। এই বিপর্যয় মোকাবিলা করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে রাজ্যকে এক হাজার কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলিয়াছেন, রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিবার পর প্রয়োজনীয় আরও অর্থ সাহায্য করা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হইতে এই ঝঞ্ঝায় নিহত ব্যক্তিবর্গের পরিবার পিছু দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবার পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই বিপর্যয়ে প্রধানমন্ত্রী যে দূরে সরিয়া থাকেন নাই, তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশেই রহিয়াছেন, তাহা এই পদক্ষেপের ভিতরেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এইখানে ইহাও উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালে আয়লা ঘূর্ণিঝড়ে যখন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সময় কেন্দ্রে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকারকে এক কোটি টাকার সাহায্য দিয়াছিল। সেই সময় কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র সরকারকে বলিয়াছিলেন, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তে যেন একটি টাকাও দেওয়া না হয়। আজ পশ্চিমবঙ্গের দুর্দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু এই মানসিকতা দেখায় নাই। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ছুটিয়া আসিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে। বিপুল আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি এই বিপর্যয়ে রাজ্য সরকারের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিবার কথা বলিয়াছে। তফাত যে মানসিকতার , তাহা ইহাতেই প্রমাণিত।

সুভাষিতম্

তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়াশ্চ মস্তকে।

বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্বাঙ্গে দুর্জনস্য তৎ।।

সাপের বিষ দাঁতে থাকে, মাছির বিষ থাকে মাথায়, বৃশ্চিকের বিষ থাকে পুচ্ছে, আর দুর্জনের সর্বাঙ্গেই বিষ থাকে।

করোনার আবহে অর্থনৈতিক সংকটে আত্মনির্ভরতাই হতে পারে একমাত্র মন্ত্র

সাধনকুমার পাল

১৫৯ বছরে এ এক অন্য ২৫ শে বৈশাখ, লকডাউনের রবীন্দ্রজয়ন্তী। ২৫ বৈশাখ, কবিগুরুর জন্মদিন। তবে ২০২০-তে সেই চেনা ছবি আর ধরা দিল না। দীর্ঘ ১৫৯ বছরে এ এক অন্য সকাল। নেই কোনও আড়ম্বর, নেই শয়ে শয়ে ভক্তের ভিড়। বন্ধ রাস্তা পথঘাট। যে কবি চার দেওয়ালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার কথা বলে গিয়েছেন, সেই কবিগুরু স্মরণ এবার কোয়ারেন্টাইনে। জানি না কবি কখনো আমাদের মতো এরকম লকডাউনে ছিলেন কিনা। তবে এই চীনা ভাইরাস অতিমারীর আবহে বর্তমান প্রজন্মের মানসিক যন্ত্রণা নিংড়ানো ভাষা হয়তো উপনিষদের ঋষির মতো কবির উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছিল। সেই উপলব্ধি থেকেই থেকেই হয়তো তিনি লিখেছিলেন 'সভ্যতার প্রতি' শিরোনামে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

'দাও ফিরে যে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারদানের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।'

শুধু সভ্যতার প্রতি নয় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে সে সময় বদলে যাওয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির দিকেও আঙুল তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিকতার নামে, পরিবর্তনের নামে সে সময় যে দিশায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সূচনা হয়েছিল কবিগুরু তার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। আজ চীনা ভাইরাস মহামারীর ধাক্কায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আবার একবার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছে। লকডাইন চলার সময় গত ১২ মে রাত আটটায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণেও সেই পরিবর্তনের সুরই ধ্বনিত হলো। প্রধানমন্ত্রী বললেন বিশ্বগুরু হতে হলে ভারতকে আত্মনির্ভর হতে হবে, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়। এখন সমস্ত বিশ্বজুড়ে অর্থকেন্দ্রিক বিশ্বায়ন বনাম মানব কেন্দ্রিক বিশ্বায়নের চর্চা হচ্ছে। ভারতই এই মানব কেন্দ্রিক বিশ্বায়নের প্রবক্তা, যার আত্মা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাবনার মধ্যে নিহিত। প্রধানমন্ত্রী আরও বললেন, 'লোকালের জন্য ভোকাল হতে হবে'। অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন উন্নত গুণমান সম্পন্ন দ্রব্য গর্বের সঙ্গে শুধু নিজেরাই নয়, অন্যকেও ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

> স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের নীতি নির্ধারকরা ভারতকে ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া জুতোতে পা গলিয়ে রাজনীতি নির্ভর, সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বহাল রেখে চলতে বাধ্য করল। ভারত স্বাধীন হলো ঠিকই কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভ করল না।

করোনা ভাইরাস মহামারী দেখিয়ে দিয়েছে বিশ্বায়নের নামে বিকাশ নয়, বিনাশই হচ্ছে। বিশ্বায়ন হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ ও শাসনের নতুন হাতিয়ার। এ ছাড়া বিগত বারো বছরে যে হারে বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়েছে, সেই হার যদি বজায় থাকে তাহলে আগামী কুড়ি বছর পর পৃথিবী আরও বড়ো সংকটের মুখে পড়তে চলেছে। এছাড়াও নানা কারণে বিশ্বায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল অনেকদিন থেকেই। বেক্সিট অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেড়িয়ে আসা, ভারতীয়দের জন্যও এইচবি১ ভিসা নিয়ে আমেরিকার কড়াকড়ির মতো ঘটনা চলমান বিশ্বায়নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস মহামারী চলাকালীন চীন থেকে জাপানি কোম্পানিগুলিকে নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জাপান সরকার বাজারে ২২০ বিলিয়ন ইয়েন বরাদ্দ করেছে। কোরিয়ান কোম্পানিগুলি চীন থেকে ভারতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অতি সম্প্রতি এফডিআই-এর ক্ষেত্রে ভারত সরকার

কড়াকড়ি শুরু করে দিয়েছে। চীন সহ বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের এফ ডি আই-এর জন্য সরকারের অগ্রিম অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চীন থেকে তাদের বিনয়োগ ফিরিয়ে নিয়ে আসার চিন্তা করছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে চলমান ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যে আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন তা ভারতের ডিএনএ-তেই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে চোখ রাখলে ভারতের নিজস্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আত্মনির্ভরতার বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝা যায়।

ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে ব্রিটেনের আদলে রাজনীতি নির্ভর, সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। সমস্যার সূত্রপাত তখন থেকেই। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের নীতি নির্ধারকরা ভারতকে ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া জুতোতে পা গলিয়ে রাজনীতি নির্ভর, সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বহাল রেখে চলতে বাধ্য করল। ভারত স্বাধীন হলো ঠিকই কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভ করল না।

স্বাধীনতার সাত দশক ধরে মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারত উন্নয়নশীল গরিব দেশের তকমা বহন করে চললেও চলমান মহামারীর জেরে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা আরও একবার ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মানুষ দেখেছে সামান্য দিনমজুরি কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজের রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। বাড়ি ফেরানোর জন্য ট্রেন, ফ্রি রেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এই মানুষগুলির কষ্ট লাঘব করতে কেন্দ্রীয় সরকার আপ্রাণ প্রয়াস করছে। কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন মানুষের এই দুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ভাগ্য ফেরানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ডুবন্ত মানুষকে জল থেকে না তুলে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের দায় চাপানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সরকারি বেসরকারি সমস্ত ব্যবস্থাগুলি সংবেদনশীলতার সঙ্গে এগিয়ে এলে এই মানুষগুলির কষ্ট নিশ্চিতভাবে অনেকটাই লাঘব হতো।

পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস বিপর্যয়ের জেরে ভারতে কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে। সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে কখনই এত মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমস্যা মোকাবিলায় আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তাতে গ্রাম ও শহরে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। কোনো জামিন বা গ্যারান্টি ছাড়াই ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ। আর্থিকভাবে দুর্বল সংস্থাগুলিকে ২০ হাজার কোটি টাকা অনুদান। ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পে আন্তর্জাতিক দরপত্র নয়। ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, শহরে শ্রমিকদের বাড়িভাড়া, গ্রামে ফিরলে ১০০ দিনের কাজে নিয়োগ, ৫০ লক্ষ হকারের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ। জনজাতি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, বৃক্ষরোপণ, পতিত জমি পুনরুদ্ধার সহ বিভিন্ন প্রকল্পে ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ, ২৫ কোটি কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ড সমসংখ্যক কৃষকের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ, প্রান্তিক চাষিদের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ। মৎস্যচাষ ও পশুপালনে ঋণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রয়াস হয়েছে। নেতিবাচক রাজনীতি না করে দেশে একটু ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করলে করোনামুক্ত বিশ্বে ভারত সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কারণ এই আত্মনির্ভরতা ভারতের ডিএনএ-তেই রয়েছে। এই ভাবনার মূলসূত্রটি ধরতে একবার ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা যেতে পারে।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর স্যার চার্লস মেটকাফ ভারতের গ্রাম্য সমাজকে বর্ণনা করে বলেছেন , ''গ্রামগুলি ছোটো ছোটো গণরাজ্য; এদের যা কিছু প্রয়োজন প্রায় সমস্তই এদের নিজেদের মধ্যে আছে; বাইরের কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এদের প্রায় প্রয়োজনই হয় না। যেখানে অন্য কিছুই টিকে থাকে না সেখানেও এরা বেশ টিকে রয়েছে। গ্রামগুলির এই জনসমাজ, এদের প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ—সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভূত ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এবং তাদের কল্যাণে মানুষ প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ও স্বরাজ ক্ষমতা ভোগ করতে পারছে।'' এই বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে এদেশের গ্রামগুলি যেন প্রায় কল্পনার স্বর্গলোকের মতো ছিল। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেছেন, ''বয়নশিল্পই তখন আমাদের জাতীয় শিল্প ছিল এবং মেয়েরা ঘরে ঘরে চরকায় সুতো কাটত''। ভারতীয় বস্ত্র শুধু ইংলন্ডে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যেত। তাছাড়া চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, আরব, পারস্য ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশেও যেত। ভারতের বস্ত্রশিল্প এতই উন্নত ছিল যে ইংলন্ডে যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। ইংলন্ডের বয়ন শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর শতকরা আশি টাকা হারে শুল্ক বসানো হয়েছিল। বিদেশি বাণিজ্যের আক্রমণে ভারতের বস্ত্রশিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হলো। ফলে বহু মানুষ কাজ হারালেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাসীন বড়লাট বলেছিলেন, ''দেশময় দুর্দশা দেখা দিয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ভারতে তাঁতিদের হাড়গোড়ে মাঠঘাট ছেয়ে গেছে।''

স্পষ্টতই ইংরেজরা এদেশের মজবুত আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ইংলন্ডের অনুকরণের রাজনীতি সর্বস্ব, সরকারি ব্যবস্থা নির্ভর ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন কবিগুরু। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ''সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে

অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা। গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শেকড় প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজস্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশি রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুঠপাঠ অত্যাচারও কম হলো না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে; যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্ন-বস্ত্র, ধর্ম-কর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশ মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রিস, রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। চীন ও ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ ---সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত। পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজ শাসন তাকে অধিকার করলো। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশ্বত্থ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল। সকলের চেয়ে বিপদ হলো এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু মর্মকথা চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। .....সমাজে তাই আমি বলেছিলুম ইংরেজ আমাদের রাজা কিংবা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজেরে দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে, স্বদেশী-সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম।"

''আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্ঠা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হোউক, আমাদের দেশে সমাজ একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে। যুদ্ধবিগ্রহ, কিয়ৎ পরিমাণে পাহারার কাজ ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর সমস্ত মঙ্গল কার্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল। ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এই জন্যই এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনুষত্ব, আমাদের সভ্যতা স্থাপিত এবং এইজন্য এই সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা চিরদিন সর্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম।"

একটি পরিসংখ্যান বলছে স্বাধীনতার সাতদশক পরেও নাকি ২০ কোটি ভারতবাসী পেটে ক্ষুধা নিয়ে, না খেয়ে ঘুমুতে যায়। কিন্তু লকডাউনের মতো চরম সংকটে সরকারি সাহায্যের লালফিতের ফাঁস খোলার অপেক্ষা না করে দেশ জুড়ে সেবা কাজের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে সক্রিয়তা প্রদর্শন করছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এতে প্রমাণ হয় 'সরকার নয়', 'সমাজ সর্বোপরি'। এই আদর্শ এখনো ভারতের ডিএনএ-তে সক্রিয়। এই জন্যই বোধ হয় লকডাউনে অনাহারে মৃত্যুর খবর নেই।

গান্ধীজীও ভাবতেন আমাদের দেশ কখনো না কখনো 'স্বরাজ' অর্জন করবে। সরকারের ওপর ন্যূনতম নির্ভরশীলতা গান্ধীজীর স্বরাজের মূল ভাব। দেশপ্রেম ও রাষ্ট্র সর্বোপরি। গ্রাম স্বরাজের এই ধারণা যে আধুনিক সময়েও সম্ভব তার দৃষ্টান্তও ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। ভারতরত্ন নানাজী দেশমুখের নেতৃত্বে শুরু হওয়া গ্রাম বিকাশের কাজের ফলে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পাঁচশোর বেশি গ্রাম এখন স্বনির্ভর। আন্না হাজারের নেতৃত্বে শুরু হওয়া খরাপ্রবণ, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মহারাষ্ট্রের রালেগাও সিদ্ধি এখন সমস্ত বিশ্বের সামনে এক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। রালেগাও সিদ্ধি যেখানে এক সময় ৮০ শতাংশ মানুষ না খেয়ে থাকতেন, গ্রাম থেকে আট দশ কিলোমিটার দূরে গ্রামবাসীরা যেতেন পাথর ভেঙে সামান্য আয় করার জন্য, এখন সেই গ্রামে বাইরের মানুষ আসে কাজের সন্ধানে। খরা পীড়িত এই গ্রামে একসময় একবার ফসল ফলানোর মতো জল পাওয়া যেতো না এখন সেখানে চেকড্যামের মাধ্যমে বৃষ্টির জল ধরে রেখে কম করে বছরে দু'বার ফসল ফলানো হয়। দুশো থেকে ২৫০ ট্রাক পেঁয়াজ এখন ব্যাঙ্গালোর চেন্নাইয়ের মতো বড়ো বড়ো শহরে সরবরাহ করা হয়। আগে ওই গ্রামে ৪০০ লিটার দুধ কেনার মতো অবস্থা ছিল না, এখন ওই গ্রাম থেকে ৬০০০ লিটার দুধ প্রতিদিন বাইরে যায়। ফলে প্রতিদিন সোয়াশো থেকে দেড় লক্ষ টাকা প্রতিদিন গ্রামে ঢুকছে। ওই গ্রামে দুই কক্ষের একটি বাড়িতে দুজন শিক্ষক দিয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল চলতো। এখন ওই গ্রামে ৪০ জন শিক্ষক, বিজ্ঞান বিভাগ সহ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। না, কোনো সরকারি সহায়তা নয়, বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগও নয়, বা কোনো ধন কুবেরের কৃপাদৃষ্টি নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এটা সম্ভব হয়েছে। রালেগাও সিদ্ধির মতো অনুর্বর জমিযুক্ত খরাপ্রবণ গ্রাম যদি লক্ষ্মীর ঝাঁপির স্থায়ী ঠিকানা হতে পারে তাহলে ভারতের অন্য গ্রামগুলি পারবে না কেন? ভারতরত্ন নানাজী দেশমুখ ও আন্না হাজারের গ্রাম স্বরাজের সফল প্রয়োগ ও 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে কবিগুরুর ভাবনা যে নতুন পরিবর্তনের রোড ম্যাপ হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

আত্মনির্ভর ভারতের প্রস্তুতি

ভারতবর্ষ কখনোও শুধু নিজের বিষয়ে চিন্তা করেনি। সবসময়ই নিজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণের কথা ভারত সর্বদাই ভেবেছে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এটিই ভারতবর্ষের চিরকালীন বিচার ও আচরণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ''আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তার প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সরলভাবে, সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।''

ড. মনোমহন বৈদ্য

করোনার সংক্রামণের কারণে মনে হচ্ছে পৃথিবীর গতি ছাড়া সমস্ত গতি যেন থেমে গিয়েছে। বিমান উড়ছে না, ট্রেন চলছে না, গাড়ি ছুটছে না, মানুষের পায়ে হেঁটে চলাফেরাও যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবী তথা প্রকৃতি স্বচ্ছ হয়ে সুস্থ শ্বাস নিচ্ছে।

এই কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত দূষণ থেমে গিয়েছে। নদীর জল পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বন্যপ্রাণী নির্ভয়ে শহরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বায়ু এত শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে হিমালয়ের হিমাচ্ছাদিত শিখর সরাসরি দেখা যাচ্ছে। এগুলি কয়েক দিনের জন্য হলেও, যা অসম্ভব বলে মনে হতো সেই সমস্ত কিছুই এর মধ্যে সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে। গতি থেমে গেলে কী হয়? এটা জানা দরকার এবং বেশ আকর্ষণীয়ও।

গতি বেড়ে কী হয় সেটা বুঝলেই গতি থেমে গেলে কী সেটা বোঝা সহজ হবে। এস. কে চক্রবর্তী তাঁর 'Rising Technology and falling ethics' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''আধুনিক বিজ্ঞান এবং তার দ্বারা বিকশিত প্রযুক্তির বিকাশ এমন একটি সময়ে হয়েছে যখন মানব জাতি, পৃথিবী ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ভাঙ্গতে শুরু করছে। বুদ্ধিভিত্তিক বস্তুবাদীদের প্রচেষ্টাই ছিল মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্কগুলিকে মজবুত করার মতো লক্ষণ, ক্রিয়াকলাপ এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগুলিকে নিরর্থক প্রতিপাদন করে সেগুলিকে অন্ধবিশ্বাস বলে দেগে দেওয়া। 'ভবিষ্যতের চিন্তা কর না'—এই ভাবনার সুচিন্তিত বহিঃপ্রকাশকেই প্রগতিশীল ও মুক্ত মানসিকতার পরিচয় বলে মনে করা শুরু হলো। আসল বিচ্ছিন্নতার সূচনা এখান থেকেই। যখন কোনো ঘনিষ্ঠতাই থাকল না তখন কীসের ভালো আর কীসের খারাপ! মনুষের ব্যবহার এবং প্রকৃতির মধ্যেকার নীতি-অনীতির বিচারের বিলোপের সবচেয়ে বড়ো স্পষ্টীকরণ এই ভাবনাতেই নিহিত আছে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পদার্থ, বায়ু, জল, কাল, দূরত্ব প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের ওপর বিজয়ের দ্বারা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বাহ্য ভৌতিক জীবনের অনেক দিকে লাভ হয়েছে। কিন্তু সমন্বয়ের বদলে একগুয়েমি; ভয় ও সম্মানের বদলে খিটখিটে ভাব ও অহংকারের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবৃত্তিকে অবহেলা করা যায় না। এই বিকৃতিই মানুষ ও প্রকৃতির দূরত্বের প্রধান কারণ। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আত্মীয়তার এই অভাব পরিবেশের প্রতি অনাচারের প্রধান কারণ তো বটেই, সেই সঙ্গে অনাত্মীয়তার এই লোকাচার মানব সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকে অধিকার করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সংগঠনের সঙ্গে সংগঠনের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং এই ধরনের অন্য সম্পর্কগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইঞ্জিনের শক্তির সঙ্গে মিলে ভৌতিক সমৃদ্ধির চরম লক্ষ্য প্রাপ্তির সাধন রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই কারণে আজকাল আন্তর্জাতিক আলোচনা সম্মেলনে চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেখানে গুপ্ত রাজনৈতিক এবং জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলা। এই প্রক্রিয়ায় নৈতিকতার কোমল ভাবনাগুলি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেগুলি যে কেবলমাত্র প্রকৃতির একটি স্রোত, উপকরণ রূপেই বেঁচে থাকে না নয়, বরং মানুষও অনৈতিক উপায়ে চতুরতার সঙ্গে প্রযুক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। যন্ত্রপাতি থেকে মেশিন, মেশিন থেকে অটোমেশন, অটোমেশন থেকে চিপ—এই নিরন্তর প্রগতি মানুষকে মানবতা থেকে দূরে, আরও দূরে নিয়ে যাচ্ছে।''

এই মানসিকতার কারণেই মানুষ কেবল প্রকৃতির সঙ্গেই নয়, সমাজ এবং সঙ্গীসাথিদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। পরিণামস্বরূপ মানুষ নিজের পরিবেশ, আত্মীয়- অনাত্মীয় সকলের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক অহংকারী, ক্রূর ও হিংস্র হয়ে পড়ছে এবং এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন সমাজই তথাকথিত 'বিকশিত', 'আধুনিক' সমাজ এবং মানব জাতি বলে স্বীকৃত। এই 'প্রগতিশীল', 'বিকশিত' সমাজের মূল, কুল, অপরিপক্ক জ্ঞান এবং জীবনের তুলনামূলক অল্প অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে মনে হয় তাদের সিদ্ধান্ত ভুল, অপরিপূর্ণ এবং বিসংগত। অপ্রত্যাশিত গতিবৃদ্ধিতে এমনটি হয়েছে। এখন এই গতি থেমে যাওয়ার কারণে নদীর জল শুদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তি তাঁরপরিবারের সঙ্গে অধিক সময় যাপন করছেন। সম্পর্কগুলির উষ্ণতা সকলে অনুভব করছেন। কত কম চাহিদার জীবন আনন্দে কাটানো যেতে পারে সেই বিষয়টি সকলে

উপলব্ধি করতে পারছেন। ভারতীয় দৃষ্টির সারমর্ম বোঝায় এমন একটি সন্দেশ আজকাল প্রসারিত হচ্ছে, ''When you can not go outside, go Inside.''

কিন্তু এর পরে কী? জগতের অর্থনীতির চাকা থেমে গিয়েছে। চাকরি চলে যাচ্ছে,। বেতন দিতে হবে। পুরনো দেনা মেটাতে হবে। লোক শহর ছেড়ে নিজের গ্রামে, নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে। যারা মাঝখানে ফেঁসে গিয়েছে তাদেরকে রাজ্য সরকারের সাহায্যে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের মতো বিবিধতায় ভরা বিশাল জনসংখ্যার দেশের সামনে এটি একটি বড়ো প্রশ্ন। বিলি লিম্ নামে এক লেখক তাঁর 'Dare to Fail' পুস্তকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যখন আপনি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তখন নিজেকে সমস্যার থেকে দূরে রাখেন, তখন সেটি হয় পরিস্থিতি। আপনি যখন সেই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন তখন সেটি চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত হয়। এবং যদি আপনি নিজ সামর্থ্য এবং সম্পদের হিসেব করে সেই অনুসারে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন তবে সেটি হবে সুযোগ। (When you face a problem and take yourself away from it, it becomes a situation. When you are to analyse it, it becomes a challenge. And when you think of you think of your resources to meet the challenge, it becomes an opportunity.—Billy Lim)

ভারতের পরম্পরাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক চিন্তা (Innovation), জিজ্ঞাসার অবসর ছিল। এর দ্বারা প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে খুঁজে বের করার উৎসাহ পাওয়া যেত। শিক্ষক বা আচার্য পড়াতেন যে কীভাবে শিখতে হয় (Teaching how to learn) এবং কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে সেটি নিজ আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে জাগতিক সুখ প্রাপ্তির জন্য ধনার্জনের শিক্ষাই বিতরণ করা হচ্ছে। এর পরিণাম স্বরূপ চাকুরিপ্রার্থী, আত্মকেন্দ্রিক এবং জড়বাদী প্রজন্ম তৈরি করে চলেছি আমরা।

ভারতবর্ষে বিকাশকে মাপার মাপকাঠি এবং তার অভিমুখ নগরকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা প্রভৃতি সমস্ত

> আমরা যদি চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের উত্তম ও সস্তা স্বদেশি বিকল্প প্রচুর মাত্রায় উৎপাদন করতে পারি তবে পৃথিবীর বহু দেশ চীনের বদলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে উৎসাহী হবে। এতে ভারতের যুবসমাজের সামনে জীবিকার নতুন সুযোগ আসবে।

সুবিধা নগরকেন্দ্রিক হতে থেকেছে। ফলস্বরূপ, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে মহানগরে, মহানগর থেকে মেট্রো সিটির দিকে, মেট্রো সিটি থেকে বিদেশের দিকে ভারতবর্ষের প্রতিভা এবং বুদ্ধির পলায়ন বা স্থানান্তর হয়ে চলেছে। সেই কারণে গ্রাম খালি হয়ে চলেছে, শহরে ভিড় বেড়ে চলেছে। শহুরে জীবন সুবিধাপূর্ণ, কিন্তু প্রচণ্ড গতিময়। ফলে মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন ও ফাঁপা হয়ে চলেছে। কিন্তু কোনো বিকল্প নজরে আসছে না।

বিশ্বায়ন (Globalisation), যেটিকে বিকাশশীল এবং অবিকশিত দেশগুলির উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার কুপরিণাম বর্তমানে চোখে পড়ছে। বিকাশশীল এবং অবিকশিত দেশগুলির শোষণের, উপনিবেশায়নের (Colonisation) পরবর্তী অবতার হলো বিশ্বায়ন। আজ সবাই এটি অনুভব করছে এবং এই দুষ্টচক্রে থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজছে। সেজন্য যখন সব থেমে গিয়েছে, সমস্ত বিশ্ব নতুন গড়নের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে, আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হলো, তাদেরকে আশ্বস্ত করার ক্ষমতা কি ভারতের আছে এবং ভারত কি সেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত?

এর উত্তর অবশ্যই সদর্থক। ভারত এই কাজ করতে পারে। কেবল ভারতই করতে পারে। কারণ ভারতের কাছে এমন তিনটি বিষয় আছে যেগুলি কেবল ভারতের কাছেই আছে। প্রথমত, ভারতের কমপক্ষে দশ হাজার বছরের অধিক সময়ের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের অভিজ্ঞতা আছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের কাছেই সৃষ্টির বিষয়ে একটি অধ্যাত্ম ভিত্তিক সর্বাঙ্গীণ ও একাত্ম দৃষ্টিকোণ এবং তার ওপর ভিত্তি করে জীবনের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার কারণে বর্তমানে পৃথিবী এত কাছে চলে এসেছে যে, সাম্প্রদায়িক (Religious), গোষ্ঠী-অনুসারী (ethnic) এবং ভাষাগত (linguistic) বিবিধতার সঙ্গে পরস্পরের পূরক একত্র জীবন যাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সংযত ভোগ দ্বারা জীবনের উৎসব পালনের শৈলী ভারত জানে। জগৎও এটি জানে এবং জগতের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাও হয়েছে। ভারতবর্ষ সমৃদ্ধির শিখরকে দেখেছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ বছর পর্যন্ত বিশ্বের বাণিজ্যে সর্বাধিক অংশীদারি ভারতের ছিল। ইতিহাস সাক্ষী যে, হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ বাণিজ্যের জন্য সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছে। কিন্তু অধ্যাত্ম ভিত্তিক হওয়ার কারণে জীবনের সর্বাঙ্গীণ এবং একাত্ম দৃষ্টির কারণে বিকশিত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর ভাবনার কারণে ভারতীয়রা কখনও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেনি। কখনও কাউকে শোষণ করেনি। কখনও কাউকে পদানত করেনি। বরং, নিজ আচরণের দ্বারা সকলকে সংস্কৃতি এবং জীবন যাপনের সুন্দরতর পদ্ধতি শিখিয়েছে; সকলকে সম্পন্ন সমৃদ্ধ করেছে (We created wealth there)। সুতরাং, ভারতের কাছে দৃষ্টিকোণ (vision), দক্ষতা (expertise) ও অভিজ্ঞতা (experience) তিনটিই আছে। ভারত দিশা দেখাতে পারে। এখন কীভাবে এগোতে হবে তার চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

এখন সমাজ এবং রাষ্ট্র হিসেবে এগোনোর উপায়টি সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ কখনোও শুধু নিজের বিষয়ে চিন্তা করেনি। সবসময়ই নিজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণের কথা ভারত সর্বদাই ভেবেছে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এটিই ভারতবর্ষের চিরকালীন বিচার ও আচরণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ''আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তারা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সরলভাবে, সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।'' এই

‘আমরা’-র বৈশিষ্ট্য আমাদের অধ্যাত্ম ভিত্তিক এবং অধ্যাত্ম ভিত্তিকতার কারণে একাত্ম ও সর্বাঙ্গীণ জীবনদৃষ্টিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। হিমালয় থেকে আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতির নামে পরিচিত, অনেক দেবতার উপাসনকারী, বহু শতাব্দী যাবৎ এখানে বসবসকারী প্রত্যেক সমাজ এই ‘আমরা’-র বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে রেখেছে, এই বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের বলে মনে করে এসেছে। এই বৈশিষ্ট্য লোকে জানে, অনেক নামে জানে। আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো—‘একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি’, ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’, ‘প্রতিটি ব্যক্তি ঈশ্বরেরই অংশ’। সর্বোপরি, ‘সেই’ ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ সকলের নিজ রুচি, প্রকৃতি এবং যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কেবল ‘তাঁর’ সঙ্গে মিলিত হওয়ার, ‘তাঁকে’ কাছ থেকে জানার পথে সর্বদা চলতে থাকতে হবে। এই চারটি প্রধান বিষয়ের উপরে আমাদের এই ‘বৈশিষ্ট্য’ প্রতিষ্ঠিত। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন। এটিই হলো ‘আমরা নিজে যাহা তাহাই.....সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠো’-র মর্ম।

আজও ৭০ শতাংশ ভারতবর্ষ গ্রামে বসবাস করে। কিন্তু এই গ্রাম আগে কেমন ছিল? গ্রামে রাস্তা পর্যন্ত ছিল না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ভালো ব্যবস্থা ছিল না। জীবিকার অবকাশ ছিল না। গ্রামে বসবাস পশ্চাৎপদতার লক্ষণ বলে গণ্য হতো। এই কারণে বিদ্যার্জন, বিদ্যার্জনের পরে জীবিকার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত শ্রেণী, প্রতিভা, মেধা গ্রাম থেকে পলায়ন করত। কিন্তু এখন অবস্থা বদলে গিয়েছে, বদলাচ্ছে এবং আরও বদলানোর সম্ভাবনা আছে। এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয়ও বটে। এখন গ্রামে রাস্তা হয়েছে। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, মোবাইল, যাতায়াতের জন্য যানবাহন সুলভ। আরও সুলভ হবে। গ্রামেই স্বাস্থ্য, উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে লোক গ্রামে থাকতেই পছন্দ করবে। শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতির সম্ভাবনা বাড়ছে। করোনার কারণে শহর থেকে লোক নিজের গ্রামে, নিজের লোকের কাছে—যেখানে তাদের শিকড় মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত—সেখানে পৌঁছচ্ছে। এর মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণীও রয়েছে। যদি তাদের গ্রামেই

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, যে সমাজে মানুষ নিজের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক নিজের কাছে না রেখে সমাজকেই ফিরিয়ে দেয়, সেই সমাজে এই সংগঠিত সামাজিক পুঁজির সাহায্যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু সে সমাজে লোক নিজের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক সমাজকে না দিয়ে নিজের কাছেই জমিয়ে রাখে সেই সমাজে মুষ্টিমেয় লোকই ধনী হয়। আমাদের দেশে সমাজকে নিজের মনে করে দেওয়াকেই ‘ধর্ম’ বলা হয়েছে।

রেখে দিয়ে গ্রামের উন্নতির কাজকর্মে যুক্ত করা যায়, সেখানেই জীবিকার ব্যবস্থা করা যায়, তবে গ্রামে ফিরে যাওয়া মানুষের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষকে আমরা গ্রামেই স্থায়ীভাবে কর্মরত অবস্থায় রাখতে পারব।

আজকের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ‘Innovation’-এর যে মৌলিক চিন্তার ঘাটতি রয়ে গিয়েছে, অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষিত শ্রেণীকে ‘Innovation’-এর জন্য প্রশিক্ষিত করা সম্ভব। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষিভিত্তিক অনেক নতুন শিল্প গ্রাম থেকে শুরু করা যেতে পারে। গ্রামসমূহের (Clusters) মাধ্যমে পরস্পরের পরিপূরক শিল্প-শৃঙ্খলের বিকাশ করা যেতে পারে। গ্রামে উৎপাদিত বস্তুসমূহকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতার কাছে অথবা স্থানীয় খুচরো বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এই কাজে অনেক যুবকের কর্মসংস্থান হবে। আজ উবের, ওলা প্রভৃতির মাধ্যমে সুন্দর সুবিধাযুক্ত পরিষেবা আমাদের দরজায়, একটি কলের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। গাড়িটি কতক্ষণে আসবে, কতক্ষণে পৌঁছবে ইত্যাদি সমস্ত তথ্য তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা হয়। সরাসরি অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব। মানুষ এগুলি জানছে এবং তার ব্যবহারও করছে। এই কারণে বহু যুবকের কর্মসংস্থানও হচ্ছে। আজ রাসায়নিক কীটনাশক ও সারের ভয়ে জগৎ সন্ত্রস্ত। জৈবিক কৃষির গুরুত্ব ও মূল্য মানুষ বুঝতে পারছে। কিছু বেশি দাম দিয়ে হলেও লোক নির্ভেজাল খাদ্য চাইছে। চাহিদা ও সরবরাহের এই শৃঙ্খলকে পরস্পরের উপযোগী, ভারসাম্য অর্থব্যবস্থা রূপে যদি বিকশিত করা যায়, সরাসরি ক্রেতার কাছে যদি এই পণ্য পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। দেশীয় প্রজাতির গোরুর দুধ ও তার থেকে উৎপন্ন দুগ্ধজাত সামগ্রীর চাহিদা বাড়তে পারে। এই সমস্ত যোজনা গ্রামকেন্দ্রিক এবং গ্রামসমূহ কেন্দ্রিক হতে পারে, হওয়া উচিত।

আজ কর্মসংস্থানের সর্বাধিক ক্ষমতা রয়েছে কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গ্রামেই ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য উৎসাহ এবং কিছু সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার। শিল্প স্থাপন যাতে সহজ ও সুলভ হয় সেই ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। প্রারম্ভিক অবস্থায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের জন্য অল্প সুদে ঋণ ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। পৃথিবীতে আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার জন্য পণ্যের ডিজাইনের উপরেও নজর দিতে হবে। কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিতে ডিজাইনের উপরে অনেক আগে থেকে নজর দেওয়া হয়েছে। সেজন্য সমগ্র বিশ্বে সেখানকার পণ্যের বিপুল চাহিদা। ভারতেও ডিজাইনিংয়ের অনলাইন কোর্স, কর্মশালা শুরু করা দরকার।

ভারতের অর্থনীতিতে চীনের বিপুল প্রভাব ছিল। করোনা মহামারীর সময়ে চীন প্রচণ্ড বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। এখন ভারত যদি চীনে উৎপন্ন পণ্য বর্জন করে তবে সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা বর্তমান। কিন্তু তার আগে যে সমস্ত পণ্য কেবল দামে সস্তা হয় বলে চীন থেকে আমদানি করা হয় সেই সমস্ত পণ্যের স্বদেশি বিকল্প ভারতে

প্রস্তুত করতে হবে। এটি এক প্রকার অর্থনৈতিক যুদ্ধই বটে। সেজন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই ব্যবস্থা করতে পারলে বহু যুবকের কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ তৈরি হবে।

অনেক দেশই চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার কথা ভাবছে বলে জানা যাচ্ছে। যদি আমরা চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের উত্তম ও সস্তা স্বদেশি বিকল্প প্রচুর মাত্রায় উৎপাদন করতে পারি তবে পৃথিবীর বহু দেশ চীনের বদলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে উৎসাহী হবে। এতে ভারতের যুবসমাজের সামনে জীবিকার নতুন সুযোগ আসবে। এটি যদি হয় তবে ভারতের রপ্তানি বাড়বে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হবে। সরকার রপ্তানিকে সহজ ও সস্তা করার ব্যবস্থা করুক। বাকি সমস্ত ঝুঁকি সমাজ নিতে প্রস্তুত হবে।

স্থানীয় স্তরের কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে মাথায় রেখেই সমস্ত পরিকল্পনা করতে হবে। প্রত্যেক দেশের জন্যই স্বদেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয়। বিশ্বায়নের 'one size fits all' এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। পরস্পরের সম্মতিতে, পরস্পরের পরিপূরক আর্থিক সহযোগিতা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক দুটি দেশের মধ্যে হলে সেটি উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে। এই সমস্ত শিল্পই গ্রামসমূহকেন্দ্রিক হলে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যও তুলনামূলক কম হবে। কারণ গ্রামে জীবন যাপনের মূল্য (cost of living) শহরের তুলনায় কম এবং জীবনের গুণমান (quality of life) শহরের তুলনায় অনেক ভালো হবে। মানুষ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে থাকবে। নিজ ভূমির সঙ্গে জুড়ে থাকবে,।গ্রামের সামাজিক জীবনেও নিজের অবদান রাখার সুযোগ পাবে। শহরে থাকার অভিজ্ঞতার সাহায্যে গ্রামেই অনেক কাজকর্মের সূচনা করতে পারবে।

এই সমস্ত কিছু কেবল সরকারের উপর নির্ভর করে করা সম্ভব নয়। সমাজের উদ্যম ও সরকারি সাহায্য—এই দুইয়ের সমন্বয়েই এগুলি সম্ভব। একটি সর্বাঙ্গীণ (total) ও একাত্ম (integrated) পরিকল্পনা করতে হবে। ধীরে ধীরে সরকারের উপরে নির্ভরতা কমিয়ে সমাজ স্বাবলম্বী হয়ে এই সমস্ত কাজকর্ম চালাতে সক্ষম হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বদেশী সমাজ'-এর কল্পনা এমনই ছিল। তিনি বলতেন, যে সমাজ যত কম সরকারের উপর নির্ভরশীল সেই সমাজ তত স্বদেশি। ভারতে নতুন শিক্ষা নীতির প্রস্তুতি চলছে। পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণের পরে শীঘ্রই সেই শিক্ষানীতি চালু হবে। যদি তা হয় তবে ভারতীয় মূলের সঙ্গে জুড়ে, ভারতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে অটল প্রজন্ম তৈরি হবে। সব রকম ভাবে ঐহিক সমৃদ্ধি এবং সম্পন্নতার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে 'ঈশ্বরতত্ত্বকে' উপলব্ধি করা এবং তাকে আত্মসাৎ করার প্রয়াস বজায় রাখা—এই দুইটিকে একসঙ্গে চালিয়ে রাখার সাধনাকেই হাজার হাজার বছর ধরে ভারতে জীবনের পূর্ণতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। 'যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সঃ ধর্মঃ'—ভারতের এই প্রাচীন বচনটির তাৎপর্য এটিই। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের নির্মাণ করলে সমাজকে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন করার ইচ্ছায় এবং কর্তব্যবোধে প্রেরিত হয়ে সমাজকে কিছু দেওয়ার প্রবৃত্তি বাড়বে। সমাজের নিকট একত্রিত এই সামাজিক পুঁজির দ্বারা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হবে।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, যে সমাজে মানুষ নিজের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক নিজের কাছে না রেখে সমাজকেই ফিরিয়ে দেয়, সেই সমাজে এই সংগঠিত সামাজিক পুঁজির সাহায্যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু সে সমাজে লোক নিজের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক সমাজকে না দিয়ে নিজের কাছেই জমিয়ে রাখে সেই সমাজে মুষ্টিমেয় লোকই ধনী হয়। আমাদের দেশে সমাজকে নিজের মনে করে দেওয়াকেই 'ধর্ম' বলা হয়েছে। শক্ত সরকারের উপরে নির্ভরশীল নয়, ধর্মের শক্তিতে শক্তিশালী সমাজই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখে অন্যরাও তাকে অনুসরণ করবে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে
লোকস্তদনুবর্ততে।।

এই সমস্ত সম্ভাবনাকে মনে রেখে ভবিষ্যতের ভারত, তার ব্যবস্থা সমূহের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা দরকার, একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা দরকার। এটিই 'করোনা কাল'-এর শিক্ষা।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

করোনা ও অর্থনীতির সংকট
সমাধান একমাত্র স্বদেশী

অম্লানকুসুম ঘোষ

বর্তমানে আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্ব এক গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে গোটা বিশ্ব আজ থরহরি কম্পমান। আড়াই লক্ষাধিক লোক মৃত, আক্রান্ত অর্ধ কোটি। আমাদের ভারতবর্ষও এর ব্যাতিক্রম নয়। সহস্রাধিক মৃত, আক্রান্ত অর্ধলক্ষ এবং ভারতবর্ষের বিপদ শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অধিক জনঘনত্বের দেশ হওয়ার কারণে আমাদের দেশের বিপদ অর্থনীতিতেও ব্যাপ্ত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়—চিকিৎসায়, অর্থনীতিতে তথাকথিত উন্নত বলে পরিচিত দেশগুলিও এই বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না। ইতালি থেকে আমেরিকা সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়ায় শোনা যাচ্ছে এর অশুভ পদধ্বনি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদে গৃহবন্দি প্রায় সকলেই। এর ফল ভোগ করছে সেই দেশগুলির অর্থনীতি। অর্থনীতির দিক দিয়ে প্রথম সারিতে থাকা সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়ার অর্থনীতি আজ দাঁড়িয়ে আছে পতনের দোরগোড়ায়। সবকটি দেশের শেয়ারবাজারে নেমেছে বিপুল পরিমাণে ধস, উৎপাদন ব্যবস্থা হয়েছে বিধ্বস্ত। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা। উৎপাদন ব্যবস্থার সাময়িক বিপর্যয় ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা, অর্থনীতির এই যৌথ বিপদ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য নানান রকম উপায় বের করার চেষ্টা করছেন অর্থনীতিবিদরা, কিন্তু এই বিপদ কেন? মহামারীর আক্রমণ শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিধিতে সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থনীতির পরিধিতে মাথা গলালো কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিতে পারছে না বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক কোনো অর্থনীতিই। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের কিন্তু তাকাতে হবে প্রাচীন ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত স্বদেশি অর্থনীতির দিকে।

উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমানে যে কোনো অর্থনীতিতে, যে কোনো একটি বস্তুর উৎপাদন, একেকটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ব্যাপকভাবে কিন্তু অন্য কোনোও বস্তুর উৎপাদন একেবারেই হয় না। ধরা যাক, এক জায়গায় ধান চাষ হচ্ছে সেখানে শুধু ধানই হচ্ছে, এক জায়গায় আখ চাষ হচ্ছে সেখানে শুধু আখেরই চাষ হচ্ছে। চাষের মধ্যেমে উৎপাদিত সামগ্রী সারাদেশে পরিবহণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যবসায়ীদের কাছে চাষিরা নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের কাছ থেকে কিনছে, জিনিসগুলি আবার সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। সেখানকার চাষিরাও তাদের উৎপাদন ব্যবসায়ীদের কাছে সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন হচ্ছে। অর্থনীতির এই বিশেষ পরিকাঠামোয় একটি জিনিসের উৎপাদকরা অপরাপর জিনিসের উৎপাদন খরচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তাই অপরাপর জিনিসের বিনিময় মূল্য সম্পর্কেও তারা অবহিত নয়। তাই নিজেদের প্রয়োজনীয় যে সব জিনিস তারা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনছে সেই সব জিনিসের মূল্য হিসেবে তারা ব্যবসায়াদের দ্বারা ধর্যে দামই প্রদান করছে। আবার তার দ্বারা উৎপাদিত জিনিসের দাম হিসেবে ব্যবসায়ীরা অন্য জায়গায় উপভোক্তাদের থেকে কত টাকা নিচ্ছে তাও তারা জানে না। তাই ব্যবসায়ীদের ধার্য দামেই তারা নিজেদের উৎপাদন বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, যেখানে ধান উৎপাদন হচ্ছে সেখানকার ধান চাষিরা জানে না যে এই ধানের বাজারদর কত, ধানের ক্রেতার কাছে সে নিজেরা সরাসরি পৌঁছতেও পারছে না, ফলে ব্যবসায়ীদের কথিত দামেই তারা নিজের উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার নিজেদের প্রয়োজনীয় যে বস্ত্র বা আখজাত চিনি তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনছে সেই সব বস্ত্র বা চিনির উৎপাদন খরচ তারা জানে না। সেই সব বস্ত্র বা চিনি উৎপাদকের কাছে তারা নিজে সরাসরি পৌছতেও পারছে না। ফলে বস্ত্র বা চিনির মূল্য হিসেবে তারা ব্যবসায়াদে ধার্য দামই প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, চাহিদা ও জোগানের নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম পুরোটাই ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল থাকছে, ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষমতা ব্যবসায়াদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের কাছ থেকে কম দামে জিনিস ক্রয় করে সেই একই জিনিস উপভোক্তাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে অর্থনৈতিক শোষণ চালানোর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত অর্থনীতির ধারা এই শোষণের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। যখন এই শোষণ করার সুযোগ কোনোও বড়ো ব্যবসায়ীর একচেটিয়া অধিকারে এসে যায় তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় একচেটিয়া বাজার অর্থনীতি বা মনোপলি মার্কেট ইকনমিক্স। আবার যখন এই শোষণ করার সুযোগ একাধিক বড়ো ব্যবসায়ীর মিলিত একচেটিয়া অধিকারে এসে যায় তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয়

অলিগোপলি মার্কেট ইকনমিক্স। আবার যখন এই শোষণ করার সুযোগ কোনোও এক বা একাধিক বড়ো ব্যবসায়ীর একক বা মিলিত একচেটিয়া অধিকারে না থেকে যে কোনও ব্যবসায়ীর আয়ত্তের মধ্যে থাকে তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় 'বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা-নির্ভর বাজার অর্থনীতি' বা 'পিওর কম্পিটিটিভ মার্কেট ইকনমিক্স'। আবার যখন এই শোষণ করার সুযোগ ব্যবসায়ীর অধিকারে না থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' অথবা 'সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট ইকনমিক্স'। এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, চাহিদা ও জোগানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ীর উপর নির্ভরশীল থাকছে না, পুরোটাই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকছে, উৎপাদিত সামগ্রীর দামও রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে। তা বলে অর্থনীতির এই বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণ হয় না তা নয়। শুধু শোষকের পরিবর্তন হয়, ব্যবসায়ীর বদলে রাষ্ট্র অর্থাৎ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রক রাজনীতিবিদ বা আমলারা শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা-নির্ভর বাজার অর্থনীতি বা পিওর কম্পিটিটিভ মার্কেট ইকনমিক্সে প্রচুর সংখ্যক ব্যবসায়ী বা শোষক থাকায় এই শোষণ তুলনায় কম হয়। কারণ নিজেদের বাজারের পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজেকে উপভোক্তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায় এবং সেকারণে একক প্রতি লাভ কম রেখেও উপভোক্তাদের কাছে জিনিসের মূল্য কম রাখে। কিন্তু শোষণ তুলনায় কম হলেও এ পদ্ধতিতেও শোষণ একেবারে বন্ধ হয় না। কারণ উপভোক্তাদের কাছে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যবসায়ীরা একক প্রতি লাভ কম রাখলেও লাভ তো একেবারে শূন্য করে না, যেটুকু ব্যবসায়ীর লাভ সেটুকুই উৎপাদক ও উপভোক্তাদের কাছে শোষণ।

প্রাচীন ভারতের স্বদেশি অর্থনীতি ছিল এর বিপরীত। সম্পূর্ণ অর্থনীতি ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত। সেই একক গুলিকে গ্রাম বলা হতো। প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি গ্রামে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে সব পেশার লোক থাকত এবং তারা বিভিন্ন রকমের জিনিস উৎপাদন করত যে জিনিসগুলি গ্রামের মানুষের সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর কাজে লাগতো। একজনের উৎপাদন অন্যজনের উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বা হয়তো মুদ্রার মাধ্যমে সরাসরি হাতবদল হতো। অর্থাৎ একই গ্রামে একজন ধান চাষ করলেন, একজন আখ চাষ করলেন, একজন তুলাচাষি বস্ত্র উৎপাদন করলেন। উৎপাদিত সামগ্রীর সরাসরি পারস্পরিক বিনিময় হলো। উৎপাদক সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতেন। উপভোক্তা সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকেই তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতেন। ধান উৎপাদক বস্ত্র ও আখের উপভোক্তা হতেন। আখ উৎপাদক বস্ত্র ও ধানের উপভোক্তা হতেন। বস্ত্র উৎপাদক ধান ও আখের উপভোক্তা হতেন। উৎপাদক এবং উপভোক্তা কাছাকাছি অবস্থান করতেন। পরস্পরের উৎপাদন খরচ জানতেন। সরাসরি পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় হতো। সেজন্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়, চাহিদা ও জোগানের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদিত সামগ্রীর দামের ওপর বাজারের, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীর অথবা রাষ্ট্রের কোনোও ভূমিকাই ছিল না। সেকারণেই সেই অর্থনীতিতে ব্যবসায়ীর অথবা রাষ্ট্রের কোনোও শোষণ ছিল না। বর্তমানে যে কোনো অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে এই শোষণ সহজেই পরিলক্ষিত হয়। যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ এই শোষণ। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক এবং উপভোক্তার মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করে এই অর্থনৈতিক শোষণ। যেমন, কলকাতা শহরে আগে খাটাল ছিল। কলকাতাবাসী এই খাটালগুলি থেকে দুধ কিনে তাদের দৈনিক দুধের বিপুল চাহিদা মেটাত। উৎপাদক ও উপভোক্তা কাছাকাছি অবস্থান করতো। উৎপাদক সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতো। উপভোক্তা সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকেই তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতো। ফলে কোনরকম অর্থনৈতিক শোষণ পরিলক্ষিত হতো না। প্রায় তিনদশক আগে আকস্মিকভাবে তৎকালীন রাজ্য সরকার পরিবেশ দূষণের অজুহাতে কলকাতা শহরে খাটাল রাখা নিষিদ্ধ করে দেয়। খাটালগুলি শহর থেকে অনেক দূরে চলে গেল। কলকাতাবাসী তাদের দৈনিক দুধের বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য দুগ্ধব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী হলো। দুধের দাম বাড়লো, অর্থনৈতিক শোষণ চালু হলো। খাটালের চেয়ে অনেক বেশি দূষণ সৃষ্টিকারী তৈলব্যবহারকারী যন্ত্রচালিত গাড়ি কিন্তু কলকাতা শহরে নিষিদ্ধ হয়নি, তবে হ্যাঁ, তজ্জনিত দূষণ কমাবার জন্য নানান নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হয়েছে। খাটালের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ না করে নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারতো, কিন্তু ব্যবসায়িক মানদণ্ড যে আজ প্রকৃতপক্ষে রাজদণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাই বণিকের অর্থনৈতিক শোষণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজেই সে নিয়োজিত হলো। এটি ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক শোষণের একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে অনেক বড়ো অর্থনৈতিক শোষণ করে চলেছে বণিককুল। বিশেষত বিদেশি বণিককুল এবং সেই শোষণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নয়, বরং

স্বদেশি অর্থনীতির পথে চলে ভারতবর্ষ অর্থনীতির ময়দানে এককালে যে সাফল্য লাভ করেছিল আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো কালে সেই সাফল্য লাভ করেনি। খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিশ্বের অর্থনীতির চল্লিশ শতাংশ ছিল ভারতের দখলে। এই অবস্থা চলেছিল প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বিজ্ঞাপন ও প্রচার মাধ্যমের ঢক্কানিনাদের দ্বারা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাবের জল আর আখের রস খাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান আমাদের দেশের মানুষের চিরন্তন অভ্যাস ছিল। এক্ষেত্রেও উৎপাদক ও উপভোক্তা কাছাকাছি অবস্থান করতো। উৎপাদক সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতো। ফলস্বরূপ এখানেও কোনোরকম অর্থনৈতিক শোষণ পরিলক্ষিত হতো না। কিন্তু বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাধ্যমের অমোঘ ঢক্কানিনাদের ফলস্বরূপ ডাবের জল আর আখের রসকে নির্বাসন দিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সকলে। উৎপাদক শোষিত হয়নি, কারণ এক্ষেত্রে বণিক নিজেই উৎপাদকের স্থান দখল করেছে। শোষণকেন্দ্রিক সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডের পরে এই জিনিসটিও লক্ষ্য করা যায় যে, সেখানে মধ্যস্বত্বভোগী বণিক নিজেই উৎপাদকের স্থান দখল করে অর্থাৎ বণিক হয়ে যায় উৎপাদক। উৎপাদন ব্যবস্থার আরও বেশি কেন্দ্রীভবন ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদক হবার প্রয়োজনীয় দক্ষতা বণিকের অধিগত থাকে না। সে বাধ্য হয় উৎপাদনের কাজে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করতে। গ্রামকেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীকৃত স্বদেশি অর্থনীতির ক্ষুদ্রতম একক গ্রামের স্বাধীন কুটির শিল্পী বা ক্ষুদ্র শিল্পী, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অথবা বাজার অর্থনীতির মারপ্যাঁচে পরিণত হয় বণিক পরিচালিত বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক। এর ফলেই দেখা যায় অর্থনীতির ক্ষুদ্রতম একক গ্রাম থেকে শ্রমিকদের বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক শহরমুখী গমন। সৃষ্টি হয় বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকের ।

স্বদেশি অর্থনীতির পথে চলে ভারতবর্ষ অর্থনীতির ময়দানে এককালে যে সাফল্য লাভ করেছিল আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো কালে সেই সাফল্য লাভ করেনি। খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিশ্বের অর্থনীতির চল্লিশ শতাংশ ছিল ভারতের দখলে। এই অবস্থা চলেছিল প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মনে রাখা দরকার, সেই সময়কালে আলেকজান্ডারের গ্রিস সাম্রাজ্যের দ্রুত উত্থান ও পতন ঘটেছে। প্রায় চারশো বছর দাপটের সঙ্গে গোটা ইউরোপ শাসন করেছে রোম। আরব সাম্রাজ্য তার আগ্রাসী লোলুপ হাত বাড়িয়েছে তিনটি মহাদেশ জুড়ে। তবু অর্থনৈতির দিক থেকে ভারতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি কেউ। ভারত কিন্তু কোনো দেশ দখল করেনি। কোথাও কোনো সাম্রাজ্য স্থাপন করেনি, বরং বহিরাগত গ্রিক, শক, হুন, কুশান, আরব প্রভৃতি আক্রমণকারীকে এরেক পর এক প্রতিরোধ করেছে; আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে পরম যতনে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারত তীব্রভাবে আক্রান্ত, পরাভূত, লুণ্ঠিত বৈদেশিক মুসলমান আক্রমমকারীদের দ্বারা। ভারতের অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও তার প্রভাব পড়ে। সেজন্য দেখা যায়, এই সময় থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত চল্লিশ শতাংশ থেকে তিরিশ শতাংশে নেমে এসেছে। তা সত্ত্বেও তখন ভারত কিন্তু বিশ্বের অন্য দেশসমূহের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। অন্য কোনো দেশই তখন বিশ্ব অর্থনীতির তিরিশ শতাংশের অধিকারী ছিল না। এ অবস্থায় চলে আরও দু'শতক। এরপর আসে ভয়ংকর অবস্থা। পরাধীনতার স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতবর্ষ তখন প্রবল অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। ফলস্বরূপ ভারতের অর্থনীতি গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে মাত্র কুড়ি শতাংশ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। তবু ভারত বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। কোনো দেশই তখন একক ভাবে বিশ্ব অর্থনীতির কুড়ি শতাংশের অধিকারী ছিল না। এমনকী ভারত তখন যাদের দ্বারা পরাধীন তারাও ভারতের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল। তুর্কি-পাঠান-মোগলের কালখণ্ডে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কুড়ি শতাংশের আশেপাশেই আটকে ছিল। এরুর এল ভারতের অর্থনীতির সবচেয়ে কালো দিন। ব্রিটিশ অধীনে ভারতের স্বদেশি অর্থনীতি বিতাড়িত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন অর্থনীতি অনুসৃত হতে শুরু করল। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদান কুড়ির নীচে নামেনি। আর ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ বিতাড়িত হলো তখন বিশ্বঅর্থনীতিতে ভারতের অবদান মাত্র দু'শতাংশ। স্বাধীনতার সাত দশক পর আজ বিশ্বঅর্থনীতিতে ভারতের অবদান মাত্র পাঁচ শতাংশ।

কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থা, পরিবহণনির্ভর বিপণন, নিজ বাসস্থানে কর্মসংস্থানহীন শ্রমিকের দল— এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি।

আজ করোনায় আক্রান্ত পৃথিবীতে সামাজিক দূরত্ব রাখার তাগিদে যখন পরিবহণ ব্যবস্থাই প্রায় বিপর্যস্ত, গোটা পৃথিবী জুড়ে তখন পরিবহণনির্ভর কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি হয়ে পড়েছে পঙ্কবদ্ধ হস্তীর মতো অচল। স্বদেশি অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বিপণন পরিবহণের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং কর্মীরাও একত্রিত হয় না, স্থানীয় স্তরে কাজ পায়। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতেও যদি স্বদেশি অর্থনীতির পথে দেশ চলতো তাহলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদে জাতীয় অর্থনীতি এতখানি বিপর্যস্ত হতো না।

বিপর্যস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ও কর্মহীন শ্রমিকের দল— এই দ্বিমুখী সমস্যায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি তথা জাতীয় অর্থনীতি এখন পরিত্রাণের পথ খুঁজছে। পথ কোথায়? পথ এখন একমাত্র সেই চিরন্তন স্বদেশি অর্থনীতি যাকে এতদিন বলা হতো দ্য থার্ড ওয়ে বা তৃতীয় বিকল্প, তা গোটা বিশ্বের কাছে আজ দ্য ফার্স্ট ওয়ে বা প্রথম তথা একমাত্র বিকল্প।

দেশের অর্থনৈতিক নবজাগরণের জন্য তাই আজ অবাহন করতে হবে সেই স্বদেশি অর্থনীতিকে এবং এই স্বদেশি অর্থনীতিকে দেশে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার মানুষের মনের মধ্যে স্বদেশি ভাবনার বিকাশ। পরাধীনতার আমলে আমরা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পেরেছিলাম বলেই বঙ্গভঙ্গকে রুখে দিতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন আমেরিকান পণ্যে জাপানের বাজার ভরে গিয়েছিল, যুদ্ধবিধ্বস্ত হতদরিদ্র জাপান কিন্তু আমেরিকান পণ্য গ্রহণ করেনি। এই স্বদেশি চেতনা ছিল বলেই জাপানের এত উন্নতি। এই স্বদেশি চেতনা ছিল বলেই আমরা ব্রিটিশকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলাম। এই স্বদেশি চেতনা ছিল বলেই একটা সময় ভারত বিশ্বঅর্থনীতিতে প্রভুত্ব করেছিল। এই স্বদেশি চেতনা যদি আবার ফিরে আসে তাহলে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। ■

অতিথি কলম

সঞ্জয় বারু

পারস্পরিক বাণিজ্য নির্ভরতার চেয়ে মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাব ভারতের দুর্বলতার বড় কারণ

প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত গড়ার সূত্রের বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে ভারতকে যথার্থ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে গেলে শিক্ষা, মানব সম্পদকে কুশলী করে তোলার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সঙ্গে এ বিষয়ে গবেষণাও বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে করোনা সংক্রমণ পরবর্তী দুনিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনা সময়োপযোগী নিশ্চিৎ। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই প্রসঙ্গে চার দফায় সরকারী পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দের বিশদ রূপরেখাও পেশ করেছেন। এখানে প্রধানমন্ত্রী যে বৃহত্তর অর্থে Macro অর্থনীতির ধাঁচা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রীকে সেই যাত্রাপথের উপযুক্ত তৃণমূল স্তরে micro level পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক জাতির কাছে সরাসরি সরকারি পরিকল্পনাগুলির উপস্থাপনাকে অনেকেই ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন UPA সরকারের নাটকীয় সংস্কার প্রস্তাবনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে সময়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মাত্র চারটি বিষয়ের পরিবর্তন আনা হয়েছিল। (১) লাইসেন্স পারমিট রাজ তুলে দেওয়া, (২) রাজস্ব খাতে ঘাটতি বিপুলভাবে কমিয়ে আনা, (৩) মাশুল নীতিতে বদল, (৪) টাকার বড়ো ধরনের অবমূল্যায়ন (devaluation সে সময় এক ডলারের বিনিময়ে মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ছিল ৮ টাকা)। সকলেই জানেন, সে সময়ের মুর্মূষু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এগুলি নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর আক্রমণে বিশ্ব অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে করোনা পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকেও সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটি যাতে বৃহত্তর সর্বস্তরের উন্নয়নমুখী হয় সেভাবেই তৈরি করতে হবে। মানুষের যেন সরকারের দক্ষতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে।

এবারেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার চারটিই বৃহৎ রূপরেখা রয়েছে। (১) জনহিতকর প্রকল্পগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ ও উন্নয়নমূলক খরচ বৃদ্ধি করা, (২) ব্যবসা সংক্রান্ত চলতি আইন কানুনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্বের বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা। (৩) অর্থনীতির বর্তমান ধাঁচায় ও পদ্ধতি এমনকি দৃষ্টিভঙ্গিতেও বদল এনে তাকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করে তোলা যাতে বিশ্ব বাজারের ওপর নির্ভরতা কমে যায়। (৪) বৃদ্ধির এই নতুন ইঞ্জিনটিতে উপযুক্ত রসদ যোগাতে লকডাউন-৪ শুরু হওয়ার সময়ের সিদ্ধান্তগুলি কেমন হবে। প্রথম তিনটির সাফল্য স্বল্পমেয়াদি স্তরে ৪নং সিদ্ধান্তের রূপায়ণ কতটা সফল হচ্ছে তার ওপরেই নির্ভর করবে। সরকারের তরফে বর্ধিত খরচ করার ফলে নিশ্চিতভাবে বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়বে। এবং স্বল্পমেয়াদে অবশ্যই রোজগার ও নিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে কিছুটা মধ্যমেয়াদি স্তরে দেশের সামগ্রিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বৃদ্ধিরও সহায়ক হবে।

> আত্মনির্ভর ও একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ভারত গড়তে আগে বলা শিক্ষা ক্ষেত্রে, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে গবেষণার ওপর জোর দেওয়া জরুরি। ভারতের বিশাল মানব মূলধনের সদর্থক ব্যবহার সরকারের উদ্দেশ্য সফল করার হাতিয়ার হতে পারে।

নীতিগত সংস্কার যেমন জমি, শ্রম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আইনে অর্থনৈতিক উন্নয়নমুখী উপযুক্ত পরিবর্তন এনে সেগুলিকে লাগু করতে পারলে সেগুলিও মধ্যমেয়াদি উপকারে আসবে। কিন্তু এগুলির প্রণয়ন ও যথোপযুক্ত প্রয়োগ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা কিন্তু সন্তর্পণে নজর রাখবে কী কেন্দ্র কী রাজ্য উভয় ক্ষেত্রে সরকার তথা সরকারগুলি কতটা আন্তরিক ও কর্মদক্ষ। অর্থমন্ত্রী যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও ধাপে নির্দিষ্ট পরিকল্পনাগুলির কথা আশাভরে ঘোষণা করেছেন তা কত দ্রুত ও নিপুণভাবে যথাযথ ক্ষেত্রগুলিতে সফলভাবে রূপায়িত হয় সে বিষয়টা বিনিয়োগকারীরা বিপুল আগ্রহে লক্ষ্য করবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী, উপভোক্তা ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য মানুষজন সরকারের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ওপর আস্থা রাখার সঙ্গে কাজ করতে পারার প্রশাসনিক দক্ষতাকেও যদি আস্থাবান হয় সেক্ষেত্রে সরকার অবশ্যই সাফল্য পাবে।

২০১৪ সালে সরকারে আসার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। এরপর নানা সমস্যায় ৬ বছর কেটে গেলেও এখনই

সামগ্রিক উন্নয়নকেই যদি তিনি প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে স্থির রাখতে পারেন এবং অন্য কিছু কিছু বিষয়কে কম গুরুত্ব দেন সেক্ষেত্রে তিনি এখনও ভারতকে সত্যিই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর শুধু নয় পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী এক জাতিতে পরিবর্তন করার ক্ষমতা ধরেন।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই কিন্তু দেশ আত্মনির্ভর হয়ে উঠুক একথা বরাবরই বলেন। বাস্তবে এই নির্ভরতার তত্ত্বটি এক একটি দলের কাছে এক একটি সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবতারে প্রকটিত হয়। মোদী তাঁর আত্মনির্ভরতার দর্শনের ব্যাখ্যায় বলেছেন আত্মনির্ভরতার অর্থ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া নয়। নয় নির্দিষ্ট কোনো নিজস্ব খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকা। আদতে দেশবাসীর মনে আত্মনির্ভরতার বাস্তব রূপায়ণ বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। এরই পরিণতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে অন্যান্য দেশ-নির্ভরতা কমে আসবে।

ল্যাটিন আমেরিকার বিশ্বের জাতিগুলির এই আত্মনির্ভরতার তত্ত্বের ওপর গবেষণা চালানো Thcotonio Dos Santos যিনি অন্যতম গুরু হিসেবে বন্দিত, তিনি বলছেন উন্নতিশীল দেশগুলির পরনির্ভরতা নির্ধারিত হয় অন্য একটি দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ও বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে। গত শতাব্দীর ৭০ দশকে প্রচারিত তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা কখনই অন্য কোনো দেশের অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত বা তার ওপর নির্ভরশীল হবে না। তাহলে ভারতবর্ষ এখন কী ধরনের নির্ভরতা কমিয়ে এনে আত্মনির্ভর হবে? আর আমাদের অর্থনীতি কোন দেশীয় অর্থনীতির ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি নির্ভর?

এক্ষেত্রে তালিকার সবচেয়ে প্রথম সারিতে থাকবে তেল রপ্তানিকারক দেশের অর্থনীতি। তেল ও গ্যাসই আমাদের আমদানির সবচেয়ে সর্ববৃহৎ অংশ। শক্তি ক্ষেত্রে (উল্লেখিত ক্ষেত্র) আমরা অন্য যে কোনো নতুন উৎসেরই সন্ধান করি না কেন, তা আমাদের আমদানিই করতে হবে অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতেও আমদানি নির্ভরতা থাকছেই। কিন্তু সৌভাগ্যজনকভাবে বিশ্ব তেলের বাজারে কম দাম আগামী বেশ কিছু সময় ভারতকে প্রয়োজনীয় সুবিধে করে দেবে। তেল ও গ্যাসের বাজার বিক্রেতার বদলে থাকবে ক্রেতার আধিপত্যে।

আমাদের দ্বিতীয় নির্ভরতা রয়েছে বাইরে থেকে টাকা পাঠানোর ওপর (foreign remittance)। এই ডলারে পরিবর্তিত অর্থ আমাদের দেশে ঢোকে বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চল ও মার্কিন মুলুক থেকে। এর একটা অংশ আমাদের মুলধনী বাজারেও যায়। এখন আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে গেলে এই FDI (Foreign direct investment) কে কি আমরা এড়িয়ে যাব? তৃতীয় নির্ভরতা রয়েছে চিরকালীন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জাম ক্রয়। এক্ষেত্রে রাশিয়া, আমেরিকা, ইজরায়েল ও ফ্রান্স আমাদের বড়ো নির্ভরতা অর্থাৎ রপ্তানিকারক। চতুর্থত, বিদ্যুতিন সরঞ্জাম, ওষুধপত্র এই দুটি ক্ষেত্রে আমরা চীনের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এই ধরনের নির্ভরতাগুলি এড়ানোর সরাসরি উত্তর অবশ্য সরকারি ঘোষিত সম্ভাব্য নীতিগুলির মধ্যে নেই। তবে প্রধানমন্ত্রীর জরুরিভিত্তিতে নজর নিশ্চয় আছে চীন নির্ভরতা পরিহার করার ওপর।

ডেন জিয়াও পিঙের নেতৃত্বে চীন দীর্ঘদিন আগেই একটা বিষয় প্রতিষ্ঠিত করেছে, একটা বিরাট অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আত্মনির্ভর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করলে কোনো হেরফের হয় না, বরং সমৃদ্ধি বাড়ে।

প্রমাণিত হয়েছে, অর্থনীতিকে উন্নতির ধাপে পৌঁছে দিতে পারলে আমদানি-রপ্তানি একই সঙ্গে বাড়তে থাকলে কোনো পরনির্ভরতা তৈরি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চীন যখন অস্ট্রেলিয়াকে সদর্পে বলেছিল তারা সে দেশ থেকে গোরুর মাংস ও মদ আমদানি করবে না, তখন তারা সরাসরি আমদানি ক্ষেত্রে তাদের শক্তি প্রদর্শনই করেছিল। অর্থাৎ যদি কোনো অর্থনীতি মনে করে তারা নির্দিষ্ট কোনো আমদানি পণ্য ছাড়াই চালাবে বা দেশের অভ্যন্তরে তার বিকল্প তৈরি করে নেবে সেক্ষেত্রে তাদের কোনো বড়ো ক্ষতি হবে না, উলটো দিকে অত্যধিক রপ্তানি নির্ভরতা বৃহৎ অর্থনীতিকেও টালমাটাল করে দিতে পারে। চীনের আমেরিকার বাজারে বিপুল রপ্তানি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধের হুমকির মুখে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে। ভারতের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটি দেশের ওপর পূর্ণ রপ্তানি নির্ভরতা কখনই নেই। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যারা চীন ছেড়ে আসতে চায় মোদী সরকার তাদের ভারতে জায়গা দিতে উন্মুখ। এতে ভারতের অর্থনীতি অনেকটাই রপ্তানি নির্ভর হয়ে পড়তে পারে। কেননা বহুজাতিক সংস্থাগুলি সারা বিশ্বে মাল বিক্রি করে। অবশ্য চীন থেকে আমদানি কমিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র লক্ষ্যে এর বড়ো ভূমিকা থাকবে। তবে আত্মনির্ভর ও একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ভারত গড়তে আগে বলা শিক্ষা ক্ষেত্রে, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে গবেষণার ওপর জোর দেওয়া জরুরি। ভারতের বিশাল মানব মূলধনের সদর্থক ব্যবহার সরকারের উদ্দেশ্য সফল করার হাতিয়ার হতে পারে।

(লেখক নীতি বিশ্লেষক এবং ভারত সরকারের পূর্বতন মিডিয়া উপদেষ্টা)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

করোনার থাবার মধ্যেও হামলা
বাংলাদেশে অস্তিত্ব সংকটে হিন্দুরা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ।। চলতি মে মাসে করোনা সংক্রমণ বাংলাদেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। এও বলেছিলেন, এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তাদের সেই আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হলো। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২৫ হাজার পেরিয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা চারশোর দোরগোড়ায়। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিস বিভাগ জানিয়েছে, গত ৯ মে পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ৯২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ হিসেবটা সরকারি মৃত্যুর সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু বাংলাদেশে করোনার এই ভয়ংকর তাণ্ডবের মধ্যেও হামলা, জায়গাজমি দখল ও হিন্দুদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার হুমকি অব্যাহত রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সৎকার নিয়ে নেতিবাচক ধারণাসৃষ্টির চেষ্টা। হিন্দুদের মধ্যে করোনার পাশাপাশি অস্তিত্ব নিয়েও নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে গত সপ্তাহে হঠাৎ করে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এক ঘোষণা দিয়ে পূর্বের নিষেধাজ্ঞা তুলে নামাজের জন্য মসজিদ পুরো খুলে দেওয়া হয়, তবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। যদিও প্রথম দিন থেকেই নামাজে গিয়ে কেউ স্বাস্থ্যবিধি মেনেছেন, এটা দেখা যায়নি। বরং দেখা গেছে, স্বাভাবিক সময়ে যেভাবে নামাজ পড়া হয়, সেভাবেই সবাই নামাজ পড়ছেন। আলেমদের একটি বড়ো অংশ মসজিদ খুলে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সরকার তাদের দাবির কাছে মাথা নত করে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ধর্মমন্ত্রী অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের ক্ষেত্রেও একই শৈথিল্য কার্যকর হবে বলে জানান। কিন্তু হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সমাজ এই শৈথিল্য মেনে নিতে নারাজ। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কমিটির এক ভিডিয়ো সম্মেলনে তিন সমাজের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এই শৈথিল্য আরও ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে। করোনার সংক্রমণ যেভাবে ভয়ংকর গতিতে এগোচ্ছে সেখানে ধর্মস্থানেও শৈথিল্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হিন্দু নেতারা বলেছেন, তবে মন্দিরে সেবায়েত-পূজারিদের তারা নিত্য পূজার্চনা

অব্যাহত রাখতে বলেছেন। বাইরে থেকে ভক্তদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের আরাধনা ঘরে বসেও হতে পারে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান নেতারাও একইভাবে সামাজিক সংক্রমণ এড়াতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। সংখ্যালঘু নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আলেমদের কাছে সরকারের আত্মসমর্পণ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্বল করে দিতে পারে।

ঐক্য পরিষদের ভিডিয়ো সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে দেশে লকডাউন শুরু হয়েছে। তারপর থেকে যেভাবে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের ওপর হামলা, তাদের বাড়িঘর, মন্দির দখল , অগ্নিসংযোগ, প্রতিমা ভাঙচুর, কিশোরী ও যুবতীদের অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করা এবং দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তা নজিরবিহীন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলিত মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই হামলা হচ্ছে। ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত ও অন্যান্য হিন্দু নেতারা বলেছেন, স্বাধীনতার পাঁচ দশকে ১৯৯০, ১৯৯২ এবং ২০০১ সালে নির্বাচনের পূর্বে ও পরে ছাড়া আর কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। এবার করোনা হানার পর গোটা দেশ যখন ভয়ংকর দুঃসময়ের মুখোমুখি তখন হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। মূল লক্ষ্য দেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করা। প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। হিন্দু নেতারা আরও অভিযোগ করেছেন, সমাজের একটি অংশ মনে করছে করোনার তাণ্ডবের সময় হিন্দুদের ওপর হামলা চালালে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন এবং সুবিধামতো সময়ে দেশত্যাগের চেষ্টা করবেন। স্বাভাবিকভাবে এই দুর্বল সময়ে তাদের জায়গাজমি দখলে নেয়া সহজ হবে। এছাড়া বাংলাদেশের পূজা সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা অভিযোগ করেছেন, করোনায় মৃত্যু কিংবা করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর পর হিন্দুদের সৎকার নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারিভাবে বলা হয়েছে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কিংবা করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর পর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী সৎকার করবে প্রশাসন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট পোশাক পরিহিত ব্যক্তিরাই মৃতদেহ স্পর্শ ও বহন করবেন। পরিবারের অন্তত একজন ধর্মীয় রীতি নিশ্চিত করতে এই দলের সঙ্গে থাকবেন। প্রশাসন নিয়োজিত দলের নেতা মৃতের পরিবারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন। দেখতে হবে কোনোভাবেই যেন ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যত্যয় না ঘটে। কিন্তু বিষয়টিকে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে, যেন পরিবারের কেউ সৎকার প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন না। দয়া করে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ সৎকারে এগিয়ে আসছেন। এতে ওই পরিবারের প্রতিই অসম্মান করা হচ্ছে। বাবা, মা কিংবা অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ আপনজনকে হারানোর দুঃখ আরও প্রকট হচ্ছে। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং হিন্দু সমাজকে এভাবে হেয় প্রতিপন্ন না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখছেন, বিজয় মাল্যের জেল ঘণ্টী শোনা যাচ্ছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৭ মে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে ভারতের পলাতক অর্থনৈতিক জালিয়াত বিজয় মাল্যের আবেদন করার আপিল মামলা খারিজ করেছিল সে দেশের উচ্চ আদালত। ইংল্যান্ড থেকে ভারত যাতে তাকে ফেরত না নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ প্রত্যার্পণের এই মামলা কয়েক বছর ধরেই চলছে। গত এপ্রিল মাসের ২০ তারিখেই লন্ডন উচ্চ আদালত তাঁর প্রত্যর্পণ নাকচ করার আবেদন খারিজ করে দেয়। তখনই মাল্যের ভাগ্য প্রায় নির্ধারিত হয়ে যায়। ভারত থেকে ১৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৯ হাজার কোটি টাকার ওপর ঋণ খেলাপী এই স্বভাবতস্কর ২০১৬ সালের ১ মার্চ সন্তর্পণে ভারত থেকে পালিয় যান। স্মরণে থাকবে, কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি রাহুল গান্ধী এই পলায়নকে বিজেপি'র যোগসাজস বলে চালাতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সংসদ চত্বরে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও মাল্যের ১/৩/১৬ তারিখে বাজেটের পরের দিনের আলাপচারিয়তার উল্লেখ করেন। তাঁর সহযোগী পি এন পুনিয়া নির্দ্বিধায় জানান, মাল্য ও জেটলির মধ্যে ৭/৮ মিনিট একান্ত কথোপকথন হয়েছে যা তাঁদের মতে মাল্যর ভারত ছাড়ার কৌশল সংক্রান্ত বলেই তাঁর অনুমান। জেটলি এই অভিযোগ পত্রপাঠ অস্বীকার করেন। সেই সময়কার টিভি ক্লিপিংস দেখলে বোঝা যায় জেটলিজী কী তৎপরতায় মাল্য প্রসঙ্গ অস্বীকার যাচ্ছেন।

এপ্রিল মাসে হাই কোর্টে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত ভারতের সিবিআই আধিকারিক আরকে গৌর জানান, 'লুটেরা ও পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীর বিরুদ্ধে এই রায় তাঁদের তদন্তকে অন্তিম রূপ দিতে বাড়তি শক্তি যোগাবে।'

> ২০১৯-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, " আপনারা ২০১৪ থেকে ৫ বছর দিয়েছিলেন, আমি ঠিক ঠিক লোককে জেলকুঠুরির সামনে এনেছি, আর ৫ বছর দিন, তাদের অন্দর করে দেবো।"

রাহুল গান্ধী পুনিয়ার অনুমান নির্ভর বক্তব্যকে ধ্রুবসত্য ধরে নিয়ে অর্থমন্ত্রী জেটলিকে মিথ্যেবাদী বলতে দ্বিধা করেননি। লন্ডন হাইকোর্টের বিচারক লর্ড আরাউন কিন্তু বলেছেন মাল্যর কিংফিসারের উড়ান সংস্থা একটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, নেগেটিভ সম্পদ মূল্য ও মূল্যায়ন সংস্থাগুলির নেতিবাচক মূল্যায়নকে অগ্রাহ্য করে ভারতের IDBI ব্যাঙ্ক নিজেদের ঋণদান নীতি অনুসরণ না করে মাল্যের ডোবা কোম্পানিকে ঋণ দিতে বাধ্য হয়। জেটলি রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী নেতা গোলাম নবি আজাদের প্রত্যুত্তরে পর পর তথ্য সাজিয়ে বলেন, মাল্যকে প্রথম ২০০৪-এর সেপ্টেম্বরে ঋণ দেওয়া হয়। ২০০৮ সালেই এই ঋণ রুগ্ন হয়ে পড়তে থাকে। ব্যাঙ্কগুলির খাতায় ৩০/৪/২০০৯ অর্থবর্ষে পরিভাষায় NPA বা অনুৎপাদক সম্পদ হয়ে পড়ে। তবুও ২১/২/২০১০ সালে অদৃশ্য চাপে এই ডুবে যাওয়া ঋণকে Restrust wing বা শোধ করার শর্ত লঘু করা হয়। বলা দরকার, এই সমস্ত ঋণই কিন্তু UPA II -এর আমলে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি

থেকে নেওয়া হয়। জেটলির ২০১৭ সালের তথ্যের সময় ২০১৫ অবধি বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৯০৯১ কোটি টাকা। লক্ষণীয়, ভারতের দু'টি অগ্রণী বেসরকারি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক HDFC ও ICICI ব্যাঙ্কও মাল্যকে লোন দিয়েছিল। কিন্তু বেসরকারি হওয়ায় তাদের মাথার ওপর বেআইনি ও অসাধু নির্দেশ নেওয়ার বা তা মান্য করার কোনো বাধ্য বাধকতা ছিল না। তারা ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে মাল্যের লাভে চলা মদ কোম্পানি United Breswiries-এর শেয়ার বন্ধক রেখে টাকা দেয়। সেই বিপদসঙ্কেত টের পেয়ে গচ্ছিত শেয়ার বাজারে বেচে নিজেদের দেনা মিটিয়ে নেয়। এর ফলে পরিষ্কার হয়ে যায় মাল্যের ঋণের সঙ্গে UPA কর্তৃপক্ষ কীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। শুধু ভারতের আদালত নয়, বিলেতের উচ্চ আদালতেও মাল্যর পরাজয় CBI ও ED-র মধ্যে যে আশা জাগায় সেটাই আরও পরিণতি পেয়েছে গত ১৪ই মে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আপিল মামলা লন্ডন হাইকোর্টে খারিজ হওয়াতে। বিশেষ করে ন্যায়াধীশ আরউইন ও এলিজাবেথ লেং যাঁরা এপ্রিলে মাল্যর মামলা খারিজ করেছিলেন তাঁরা এদিন বলেন, এক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগুরুত্বের (Public Importance) মতো কোনো বিষয় নেই, সেকারণে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাও এই মামলার নেই।

এখন লন্ডনের বিলাসবহুল বেকার স্ট্রিট ও Hertford hire-এর ৩০ একর জুড়ে থাকা প্রায় ৮০ কোটি টাকার খামারবাড়িতে মাত্র খান পঞ্চাশেক বহুমূল্য গাড়ি ও অন্যান্য বিলাস ব্যসন নিয়ে বসবাস করার (কেননা ইনি ঠগ ছাড়াও অত্যন্ত বিকৃতমনস্ক নারীলোলুপ একজন মানুষ) দিন হয়তো হাতে গোনা হয়ে আসছে। কেননা সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে তাঁর option গুলি সীমিত হয়ে আসছে। প্রত্যর্পণ আইনজ্ঞ বেগ কিথ বলেছেন, এই রায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার ক্ষেত্রে মাল্যকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে যে ভারতের জেলগুলি বসবাসের পক্ষে নিরাপদ নয়। কিংবা তিনি বর্তমানে চলা 'ফোরোনা সরক্রসনের' প্রসঙ্গও তুলতে পারেন। এগুলি সবই তাঁর অপরাধের পরিধির বাইরে। পড়ে রয়েছে ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস (ECHR)। এঁরাও কিন্তু দেখবে তাঁর অপরাধ স্থলের দেশে ফিরে গেলে কাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। কেননা এগুলি সাধারণত রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ভারতীয় জেলের বিষয়ে তো প্রধানমন্ত্রী ইতিপূর্বেই কমনওয়েলথ সম্মেলনের অবকাশে ব্রিটেনকে বার্তা দিয়ে রেখেছেন যে Arthar Road জেলে তাঁরা মহাত্মা গান্ধীকে রেখেছিলেন, এই ব্যক্তি তাঁর থেকেও উচ্চমার্গের? বিষয়টা তাদের ভাবাবে।

দেশের এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট তাই চরম আশাবাদী। আগামী ২৮ দিনের মধ্যেই হয়তো তারা লন্ডন উড়ে যাবেন। ইনজাংসন প্রার্থনা নামঞ্জুর হলে (সে সম্ভবনা প্রবল) লন্ডনের হেথরো বিমানবন্দরেই তাঁরা এই ভয়ংকর অর্থনৈতিক সন্ত্রাসীকে হেফাজতে নেবেন। পুলিশবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে বর্তমানে সাড়ে ছ'কোটি টাকার ব্যক্তিগত জামিনে থাকা পলাতক আসামি আর্থার রোড জেলের নির্ধারিত ১২ নং ব্যারাকে ঢুকবেন যার ছবি আগেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকেরা নিয়ে গেছে।

২০১৯-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, '' আপনারা ২০১৪ থেকে ৫ বছর দিয়েছিলেন, আমি ঠিক ঠিক লোককে জেলকুঠুরির সামনে এনেছি আর ৫ বছর দিন, তাদের অন্দর করে দেবো।'' ৫ বছর তো পেয়েছেনই, হয়তো সেই উদ্বোধন মুহূর্ত সমাগত!

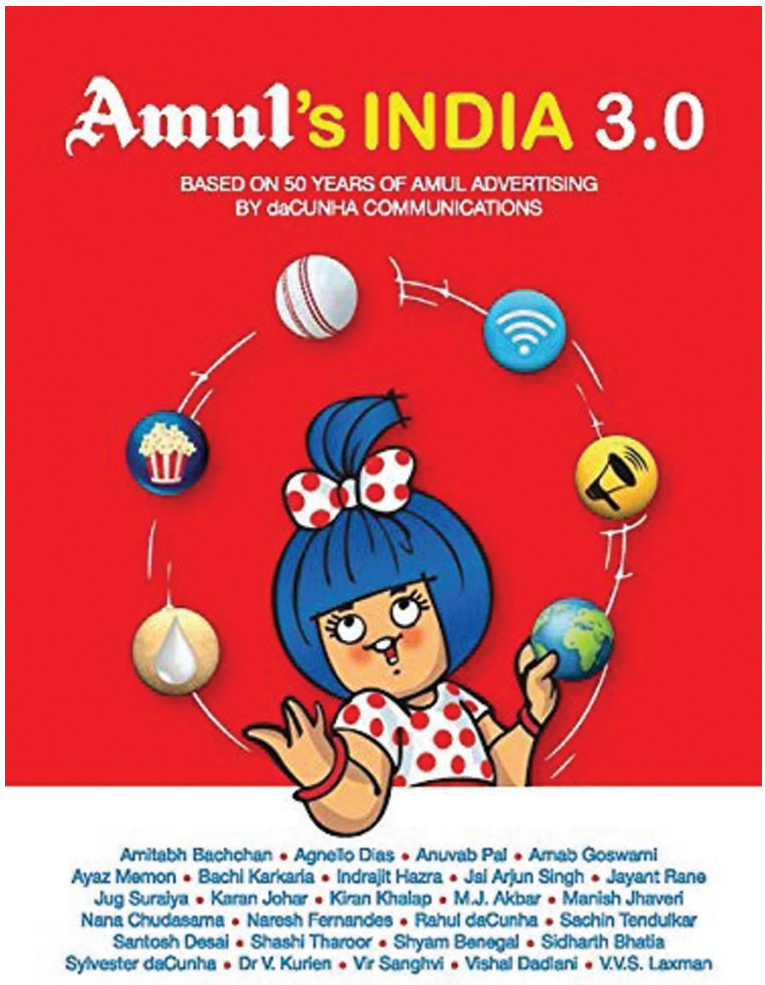

বাঙ্গালির শিরায় ধমনীতে মহাকাব্যের স্রোত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

একটি বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃখ করে বলেছেন, ''এতকাল আমাদের দেশের যে-কেহ অক্ষর মাত্র পড়িতে জানিত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত না পড়িয়া ছাড়িত না। যাহার অক্ষরবোধ ছিল না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিত। এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল; এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজকাল আমরা যাহাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলি, সেই সমাজে এই দুই গ্রন্থ এখন আর কেহ পড়ে না।'' রামায়ণ মহাভারত না পড়ার হতাশা অন্য একটি চিঠিতেও তিনি লিখে গিয়েছেন, ''কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।''

দেশীয় পুরাণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সদর্থক আসক্তি ছিল। আর ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন শিশুপাঠ্যে শিশুকে সবসময় তার ঐতিহ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দিতে হবে। ঐতিহ্যের শিক্ষার মধ্যেই শিশুকে সবচাইতে ভালোভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব। শিশুকে যথোপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়তা করে দেশ ও তার ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের প্রতি টান, ঐতিহ্য-বিষয়ক জ্ঞান একেবারে ছোটোবেলা থেকেই আসা দরকার। রবীন্দ্র-মানসে ঐতিহ্য তাই লেপটে আছে, ঢুকে আছে সহজপাঠে, শিশু কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে। একইভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্বিত রামায়ণের অমোচ্য কলম, যাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না কোনোদিনও। ''তোরা যে যা বলিস ভাই/আমার সোনার হরিণ চাই।'' 'রাম' বলতেই ভারতীয় শিশুর কাছে এক অমোচ্য চিত্র ফুটে ওঠে। মিথোম্যানিয়ার জন্যই সহজপাঠ বইটি আজ সেকুলার, বিধর্মী আর বামেদের কাছে এতটা ব্রাত্য!

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিপুল গবেষণা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'-তে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভারতীয় মহাকাব্য যে ভারতের ইতিহাস, তা বলার ক্ষেত্রে স্পষ্টবাদী ছিলেন রবীন্দ্রনাথও। ''রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।'' কথায় বলে, 'যাহা নাই

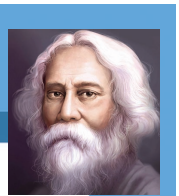

রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

মহাভারতে তাহা নাই ভারতে।' এত বিচিত্র ও বিপুল বিষয়ের অবতারণা মহাভারতে আছে যে তার অধিক বিষয় ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশেও অসম্ভব। মহাভারতের কাহিনির মধ্যে চিরকালীন ভারতীয় সমাজের চিত্রটি যেন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত।'' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরও একই কথা, ''মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানব সমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।'' শ্রীঅরবিন্দের মতে, এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাহিনি।

রাম বাঙ্গালির দেবতা নয়, এটা বাম-কংগ্রেস-নকশাল প্রায়ই বলে থাকে। কাছে গেলে শোনা যায়, রাম উত্তর ভারতের গুটকাখোদের দেবতা। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ যদি মেলে ধরা হয়, তারা প্রবল অস্বস্তির সম্মুখীন হন। বাম আমলে কৃত্তিবাসী পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার হলে হয়তো বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকতো। নেহাত ১৮০২—০৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পাঁচ খণ্ডে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রকাশ করে ফেলেছিল তাই রক্ষে!

যারা বলেন রাম বাঙ্গালির দেবতা নন, তারা কী জানেন রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন? ''বাঙ্গলাদেশে যে এক সময়ে সমস্ত জনসাধারণকে একটা ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিল; সে ভক্তিধারার অভিষেকে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলেই এই আনন্দের মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়াছিল—বাঙ্গলা রামায়ণ, বিশেষভাবে, বাঙ্গলাদেশের সেই ভক্তিযুগের সৃষ্টি। বাঙ্গলাদেশে সেই যে এক সময়ে একটি নবোৎসাহের নব-বসন্ত আসিয়াছিল, সেই উৎসবকালের কাব্যগুলি বাঙ্গালির ছেলে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করে, তবে দেশের যথার্থ ইতিহাসকে সজীবভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।''

তা কবে থেকে বাঙ্গালি রামনামে জারিত? কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর স্বাদ বাঙ্গালি পেয়েছে অন্তত ছ'শো বছর আগে। অনুমান করা যায় তার আগে থেকেই বাঙ্গলার প্রবুদ্ধ মহলে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের চর্চা ছিল এবং লোককথায় তার অবিসংবাদিত বিস্তারও ছিল। লোকায়ত-মানসে এমন শক্ত ভিত্তি না থাকলে কৃত্তিবাস এমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় রামায়ণ কাব্য লিখতে প্রেরণা পেতেন না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, রামায়ণ বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দু বিরোধী ভ্রান্ত সেকুলারি সমাজ শ্রীরামকে অবাঙ্গালির দেবতা বলে দেগে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, তুলসীদাসী রামচরিতমানস লেখা হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পরে। সম্ভবত রামজন্মভূমি-বাবরি ধাঁচা বির্তকে বাঙ্গালিকে শামিল না করানোর 'সেকুলারি-চালাকি' ছিল 'অসত্য কথা বলা ইতিহাসবেত্তা'-দের।

শ্রীরামকৃষ্ণের কুলদেবতা শ্রীরামচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের রাম-উপাসনা, রানি রাসমণির রঘুবীর সাধনাকে বাঙ্গালি ভুলে গেছে। বাঙ্গালি কীভাবে ভুলে যায় বঙ্গভূমির ঘরে ঘরে জপিত মহামন্ত্র ''হরে রাম হরে রাম / রাম রাম হরে হরে / হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ / কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে''।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিয়ে বামপন্থীদের যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কাজ করে, তার একটি ছোট পরিচয় তুলে ধরা যাক। মহাশ্বেতা দেবী কোনো এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ''কৃত্তিবাসের রামায়ণে আলাদা করে কোনো অন্ত্যজ ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অসামান্য ভাষায় ও ছন্দে বাংলায় লিখেছিলেন মাত্র।'' (দেবী মহাশ্বেতা ১৩৯৫ কৃত্তিবাসের রামায়ণে অন্ত্যজ ভাবনা, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, ফলিয়া-বয়রা, নদীয়া, পৃষ্ঠা ১৫১)। কিন্তু সত্যিই কী তাই?

কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিয়ে বামপন্থীদের যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কাজ করে, তার একটি ছোট পরিচয় তুলে ধরা যাক। মহাশ্বেতা দেবী কোনো এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ''কৃত্তিবাসের রামায়ণে আলাদা করে কোনো অন্ত্যজ ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অসামান্য ভাষায় ও ছন্দে বাংলায় লিখেছিলেন মাত্র।''

১. শ্রীরামের সঙ্গে চণ্ডাল গুহকের মিতালি কবি কৃত্তিবাস যে ভাষায় বলেছেন, তার পর মহাশ্বেতা দেবীর উচিত হয়নি কৃত্তিবাসে অন্ত্যজ ভাবনা অনুপস্থিত। কৃত্তিবাস লিখেছেন, ''চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে / পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে।'' মনে রাখার মতো বিষয় এই, কৃত্তিবাস যখন এমন কথা লিখছেন, তখনও আবির্ভূত হননি সাম্যবাদী ভক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। এমন মানুষের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর 'সাড়েছয়ানা' টাইপের মন্তব্য আমাদের ব্যথিত করে।

২. সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সখ্য, বানরকুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কীসের ঈঙ্গিতবাহী?

৩. অন্ত্যজ শবরীর হাত থেকে শ্রীরামচন্দ্র ফল গ্রহণ করছেন, সেই জায়গাতেও কৃত্তিবাস মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণের শিকড় যে কতটা মজবুত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানান বনবাসী কৌমগোষ্ঠীর পুরাণ কথাতেও। একটি বিরহড় লোককথা, 'রাম-সীতা-হনুমান' গল্প; সেখানে শোনান হয়েছে তেঁতুল আর খেজুর পাতার অভিযোজনের গল্প। 'রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলে গেল। সেখানে তারা 'উথলু' বিরহড়দের মতো যাযাবরের জীবন কাটাতে লাগল। থাকত পাতার ছাওয়া কুঁড়েঘরে। একবার একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছের তলায় ঘর তৈরি করল তারা। সেই সময় তেঁতুল গাছের পাতা ছিল মস্ত বড়ো বড়ো; ভেতর দিয়ে রোদ ঢুকতে পারত না। রাম ভাইকে বলল, আমরা বনবাসে এসেছি, এখানে কষ্টে থাকতে হবে, আরাম করা চলবে না। কিন্তু এই গাছের ছায়ায় আমরা সুখে আছি, আমাদের গায়ে রোদ বৃষ্টি লাগছে না। এটা তো ঠিক নয়। তুমি তির মেরে পাতাগুলোকে চিরে দাও। লক্ষ্মণ তির মেরে তেঁতুল পাতাগুলোকে চিরে ফালাফালা করে দিল। একটা পাতা চিরে অনেক ছোটো ছোটো পাতা হয়ে গেল। সেই পাতার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল আর রোদের তাপ তাদের দেহে লাগল। সেইদিন থেকেই তেঁতুল পাতা এত ছোটো হয়ে গেল। আবার চলেছে তিনজন বপনথ দিয়ে। এবার তারা ঘর তৈরি করল খেজুর গাছের নীচে। সেইকালে খেজুর পাতা ছিল খুব লম্বা আর চওড়া। বৃষ্টির জল আটকে দিত সেই পাতা। রাম আবার ভাইকে তির ছুঁড়তে বলল। লক্ষ্মণ তির মেরে খেজুর পাতাকে সরু সরু করে দিল। সেইদিন থেকে খেজুর পাতা সরু সরু হয়ে গেল।' এই গল্পটি বনবাসী সমাজে প্রচলিত অনেকানেক গল্পের মতোই, যা প্রমাণ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি বনবাসী কৌমসমাজেরও উত্তরাধিকার।

বামপন্থী নানান ন্যারেশনে রামচরিত্রকে ছোটো করে দেখানো হয়েছে। সমকালকে বিচার না করে তাঁর চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে নানান অসঙ্গতি। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেবর্ষি নারদকে দিয়ে বলাচ্ছেন রামচরিত্রের অপূর্বতা, অমৃতভাষণ—

...''কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম।
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।।"
(কবিতা—ভাষা ও ছন্দ)

আমরা দেখি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বর মানতেন না, তা প্রমাণ করতে বামপন্থীরা খুবই যত্নবান ছিলেন। অথচ ১৮৬০ সালে বিদ্যাসাগরই লিখেছিলেন 'মহাভারত'—উপক্রমণিকা ভাগ এবং রামায়ণের উত্তরকান্ড অবলম্বনে 'সীতার বনবাস'। সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত লিখে মহাকাব্য পড়ার একটি কৈশোর জীবন তৈরি করে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে আছে, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ সংসারশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়।

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মাহাভারতং বিদুঃ।।
তথৈব শিবধর্মাশ্চ বিষ্ণুধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।
সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত গীতোপদেশ বা শ্রীমদ্ভগবত গীতা মহাভারতেরই এক অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি। বলা হয় গীতার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগ আগমনের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্মপ্রণালী রেখে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, "গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সর্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।"

মহাভারত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। যে উদ্দেশ্যে মহাভারত রচিত হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি গীতার মধ্যে। "আতস কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনই একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা"—এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। আর তাতে পরিষ্কার মতামত হলো, মহাভারতের সঙ্গে লোকশ্রুতি জনশ্রুতির এক অনন্য আধার। গীতার বাণী সত্যযুগের মহালয়া, আগমনীবার্তা। সত্যের আগমনে গীতাধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। কী সেই প্রচার? গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ; তিনি কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী হিসাবে দর্শিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; মানবদেহে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী লীলা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাবীর অর্জুন গীতারূপ জ্ঞানের পাত্র, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাই, প্রিয় সখা, পরম হিতৈষী বন্ধু এবং ভগ্নীপতি। ভগবান তাঁকেই গীতার পরম রহস্যের অমৃতবাণী শোনার জন্য বরণ করে নিয়েছেন। সখা ও সহায় যিনি, তারই কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করে মানবজাতিকে তুলে দিচ্ছেন অর্জুন। গীতার 'অবস্থা' কুরুক্ষেত্র হলেও, মঞ্চ সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল হলেও, দেখা যাচ্ছে সেখানেই এর দীপ্ত কথাচারণা। ভগবান কী, জগৎ কী, সংসার কী, ধর্মপথ কী, গীতায় তার সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষাই গীতার মূল উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বললেও বোধহয় ভুল হবে না। তিনি রামায়ণের সেরা ভাষ্যকার, কারণ তিনি রামায়ণের কাহিনিতে জারিত হয়েছিলেন। আর তা আত্তীকরণ করে তা সুপাচ্য সাহিত্য-ব্যঞ্জন রূপে পরিবেশন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু সাহিত্য-কর্ম তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়ন নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের লেখা থেকে জানা যায়, সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা তিনি পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত আছে, তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (১৩৪৩) 'কৃত্তিবাস রামায়ণ'। রামায়ণ সম্পর্কে কবির এতটা আগ্রহ, এটা শুরু হয়েছিল কবির জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর জীবনকে একরকম আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে দেখতে পাই, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের অবাধ্য মনের আবহ যেন বদলে যেত রামায়ণের আবহে। পাঁচালি গায়ক কিশোরী চাটুজ্জে জোড়াসাঁকোয় আসতেন গান গাইতে। 'ছেলেবেলা' (১৩৪৭) নামক আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধেও তিনি উল্লেখ করেছেন রামায়ণে মজে থাকার আনন্দকথা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বই পড়তে গিয়ে করুণ বর্ণনায় তাঁর চোখ দিয়ে যখন টপটপ করে জল পড়ত, দিদিমা জোর করে তাঁর হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে যেতেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজও ভুলি নাই।"

রবীন্দ্রনাথের দু'টি গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৮৭) এবং 'কালমৃগয়া' (১২৮৯)-য় সংস্কৃত রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। 'অহল্যার প্রতি' (১২৯৭), 'পতিতা' (১৩০৪) কবিতার কাহিনি নির্মাণ হয়েছে রামায়ণের গভীর পাঠ অনুসরণ করে। 'পুরস্কার' (১৩০০) কবিতাতে ধরা পড়েছে রামায়ণের নির্যাস, 'চিত্র' কাব্যের 'নগর সঙ্গীত' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে রামায়ণ সম্পর্কিত 'মিথোম্যানিয়ায় আক্রান্ত' হতে দেখি। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ ও 'সহজপাঠ'-এ তো রবীন্দ্রনাথ শিশু মনকে রামায়ণে জারিত করে দিয়েছেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলাভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশি ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না।..... কিন্তু আজকাল আমরা জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই।"

শিশু কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দু'ভাবে শিশুকে রামায়ণের সঙ্গে সংপৃক্ত করে দিচ্ছেন, নাম-বাচক শব্দে এবং প্রকৃতি চিত্রণে। কখনো নাম না বলেই শিশু রামায়ণের দেশে পাড়ি দিয়েছে—"মা গো, আমায় দেনা কেন / একটি ছোটো ভাই— / দুইজনেতে মিলে আমরা / বনে চলে যাই।" এখানে নাম না করেও শিশু নিজের সঙ্গে শ্রীরামকে অভেদ কল্পনা করেছে, ছোটো ভাইটি যে সহোদর লক্ষ্মণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতি চিত্রণে রামের বনবাস-জীবন কল্পনায় মুহূর্তেই চলে আসে—"চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই / এমনি বরষাতে..."। রাজপুত্রের বনবাসী হয়ে যাওয়া বাঙ্গালি তথা ভারতীয় শিশুর মানস-কল্পনায় কতটা প্রভাব এনেছিল, 'সহজপাঠ'-এর একটি কবিতায় কবি তা এক লহমায় ধরে দিয়েছেন—"ঐখানে মা পুকুরপাড়ে / জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে / হোথায় হব বনবাসী— / কেউ কোথাও নেই। / ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট কুঁড়ে / শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে / থাকব দুজনেই।" কি বলবেন একে, মিথোম্যানিয়া নয়? রামায়ণ ম্যানিয়া নয়! পারবেন তো এই শিকড়কে কেটে দিতে! আমার কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন। আপনার?

পরলোকে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রবীণা সেবিকা শ্রীমতী কমল চক্রবর্তী

শ্রীমতী মৌসুমী কর্মকার ।। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রবীণা সেবিকা শ্রীমতী কমল চক্রবর্তী গত ২১ মে ভোরে কলকাতা উলটা ডাঙ্গার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। রেখে গেলেন স্বামী, ২পুত্র, নাতি-নাতনি-সহ গুণমুগ্ধ স্বজনদের।। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণেই সমিতির প্রান্ত নিধি প্রমুখের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়ে নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সহধর্মিণী কমলদি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন প্রান্ত কার্যবাহিকা স্বর্গত প্রতিমা বসুর অনুপ্রেরণায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। বিভিন্ন দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার পালন করেছেন। তিনি প্রান্তীয় গীত প্রমুখের দায়িত্বও পালন করেন। প্রতিমাদির লেখা ও কমলদির সুরারোপিত 'শোন শোন সেবিকা বোন' গানটি আজও বঙ্গপ্রান্তের প্রতিটি সেবিকার অত্যন্ত প্রিয় ও প্রাণের গান। শুধু সমিতির বর্গে নয়, সমস্ত বিভাগে কমলদির অংশগ্রহণ এবং কথায় কথায় গানের সঙ্গে নাচের সংযোজন প্রতিটি সেবিকাকে আকৃষ্ট করত। বলা যায়, তাঁর উপস্থিতিতেই একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। সদাহাস্য, মধুর স্বভাবা, মাতৃস্বরূপা, স্নেহময়ী কমলদি ছিলেন একজন সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। তাঁদের বাসগৃহটি তাঁর হস্তশিল্পের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে শিল্পালয়। তাঁদের বাড়িতে সমিতির যে শাখাটি চলত সেখানে তিনি স্বয়ং সেবিকাদের সূচীশিল্পের প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাতে সৃষ্ট শিল্পকর্মগুলি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। আমরা কলকাতার সেবিকারা তাঁর কাছ থেকে অনেক রকমের সেলাই শিখেছি। শুধু তাই নয়, আলপনা ও রান্নারও নানান পদ্ধতি তিনি শেখাতেন । ছোটোবেলায় প্রশিক্ষণ বর্গে দেখতাম, রাঁধুনি থাক বা না থাক, রন্ধন ও ভোজন বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব একা সামলাতেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। সংখ্যা যাই হোক কেউ অভুক্ত থাকত না। রান্না কমও পড়ত না, বেশিও হতো না– এমন ছিল তাঁর পরিমাপ জ্ঞান। পরিবেশনের সময় কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে যে-কোনো পরিস্তিতিকে সামাল দেওয়া যায় তা-ও তিনি শেখাতেন সেবিকাদের। তাঁর লক্ষ্য থাকত সেবিকাদের আদর্শ ভারতীয় নারী হিসেবে গড়ে তোলা। তাই সব কিছুর পাশাপাশি তিনি চাইতেন সেবিকাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটুক। সেজন্য সেবিকাদের পড়াশোনায় রুচি নির্মাণের জন্য তিনি নিজের সংগ্রহের সমস্ত বই দিয়ে পাঠাগার খুলেছিলেন। শুধুমাত্র সুগৃহিণীই নয়, তিনি ছিলেন ভারতীয় নারীর সমস্ত গুণের আধার স্বরূপা একজন আদর্শ সেবিকা। দেশমাতৃকার পূজায় চন্দনের মতো সুরভী ছড়িয়ে নিলেন বিদায়। পূজনীয় শ্রীগুরুজী একবার তাঁদের বাড়ির যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরেই ঘুমের মধ্যেই কমলদির জীবনাবসান হয়। করুণাময় ঈশ্বর তাঁর বিদেহী আত্মকে চিরশান্তিতে বিরাজিত রাখুন।

কমলদির প্রয়াণের খবর পেয়ে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় পূর্বতন প্রমুখ-সঞ্চালিকা বন্দনীয়া তাঈজী মেঢ়ে, বর্তমান প্রমুখ-সঞ্চালিকা মাননীয়া শান্তা আক্কাজী, প্রমুখ কার্যবাহিকা সীতীদিদি, প্রমুখ সহ কার্যবাহিকা চিত্রা তাঈ ও সুনীতাদিদি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।